অপরা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

কলকাতা • নিউ স্ক্রিপ্ট • ১৭২।৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ

প্রথম সংস্করণ। বৈশাখ, ১৮৮০ শকাব্দ
প্রকাশক: সুচরিতা দাশ
নিউস্ক্রিপ্ট। ১৭২।৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ২৯
প্রচ্ছদপট: সুবোধ দাশগুপ্ত
মুদ্রক: রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪১ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ১৩
ব্লক: রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট। ৭।১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা ৬
প্রচ্ছদপট মুদ্রক: দি নিউ প্রাইমা প্রেস। ১১ ওয়েলিংটন স্কোয়ার কলকাতা ১৩
বাঁধাই: ইস্টএন্ড ট্রেডার্স। ২০ কেশব সেন স্ট্রীট, কলকাতা ৯

দাম: ৩.০০ টাকা

সাধন-কে

বাড়ি ঢুকতে কেমন যেন বুকের ভেতরটা একটু কেঁপে উঠল সুপ্রিয়ার। রাস্তার আলোতে হাতঘড়িটা আবার দেখে নিলে। বাসে উঠে দু'বার দেখেছে। তবু আরেকবার দেখতে হল। দশটা সাত! তেমন কি বেশি রাত! কিন্তু দাদার ঘরে আলো ছাড়া সব অন্ধকার।

সত্যি বলতে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে রাত দশটায় এম্নি একা বাড়ির দিকে আর কোনোদিন সুপ্রিয়া তাকায় নি! সুপ্রিয়া বাড়ি থাকলেও রাত দশটায় রাস্তা থেকে বাড়িটা হয়ত এম্নি দেখায়। শুধু রাত জেগে পড়াশুনো করলে তার ঘরেও আলো জ্বলতে থাকে।

কিন্তু একথা ভেবে সুপ্রিয়া নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না। অপরাধ-বোধ থেকে মুক্ত করতে পারছিল না নিজেকে। সিঁড়িতে, বারান্দায় নিজের পায়ের জুতোর শব্দটাও যেন অদ্ভুত লাগছিল কানে।

মা'র ঘর বন্ধ। মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। বৌদি? দাদার ঘর অবধি হেঁটে গিয়ে উঁকি দিল সুপ্রিয়া। দাদাও ফেরেন নি। টেবিলের উপর একটা বই খোলা রেখে বউদি ঢুলছেন। থাক্।

নিজের ঘরে চুপচাপ ফিরে এসে সুপ্রিয়া আলো জ্বাললে। দরজা ভেজিয়ে শাড়ি-ব্লাউজ পাল্টে হাতমুখ ধুতে যাবে, তখন বৌদি এসে হাজির।

"এত দেরি হল যে—" আধ-বোজা চোখে ধরা-গলায় জানতে

চাইলেন বৌদি।

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলে সুপ্রিয়া: "দাদা ফেরেন নি যে এখনো?"

"কী এক পার্টিতে গেছেন!" প্রশ্নের উত্তর পেতে বিশেষ কৌতূহল ছিল না বৌদির—চলে যেতে যেতে বললেন: "তোমার খাবার ওখানে ঢাকা আছে, দেখেছ ত?"

ঠোঁটের রেখায় একটু হাসির ভঙ্গী ফুটিয়ে তুলে সুপ্রিয়া বললে: "বাড়ির দু'জন অভুক্ত আর তোমরা ঠাকুর-চাকরকে ছুটি দিয়ে দিলে!"

"আমি ত ভাবছিলাম তুমি হোটেলে খেয়ে আসবে—" বৌদিও হেসে বিদায় নিলেন।

মুখে হাতে পায়ে ঠান্ডা জলের শিরশির অনুভবে সুপ্রিয়ার মনে পড়ল রাস্তায় দাঁড়িয়ে বুক কেঁপে ওঠার কথা! কেন এমন হয়েছিল? দুর্বলতা ত বটেই, কিন্তু কেন দুর্বলতা! মা কী মনে করবেন, দাদা-বৌদি কী ভাবতে শুরু করবেন—এই ত! হাসতে চাইল সুপ্রিয়া। যেন ইস্কুল-কলেজে পড়া সেই সুপ্রিয়াই আছে সে আজও! কী অদ্ভুত। চার বছর হতে চলল সে অধ্যাপিকার কাজ করছে—ট্র্যামে বাসে ভীড় ঠেলছে—পড়ুনি মেয়েদের উপর অভিভাবকত্ব করছে, তার দুর্বলতা থাকলেও তা বেমানান।

খাবারের ঢাকনা তুলে সুপ্রিয়া সহজ হয়ে এল। খাওয়া এমনই একটি কাজ যখন শত দুশ্চিন্তা ভুলে থাকা যায়। 'আমি ত ভাবছিলাম তুমি হোটেলে খেয়ে আসবে'—বৌদির কথাটা মনে শুনতে পেল আবার সুপ্রিয়া। আশ্চর্য! নিরঞ্জন কিন্তু বলে-

ছিল হোটেলে খেয়ে নিতে। সুপ্রিয়া যদি রাজি হয় তাহলে দু'একটা স্পেশ্যাল ডিশ আজ খাওয়া হবে তার—আটপৌরে ডাল-ঝোল ছাড়া অন্য কিছু— বলেছিল নিরঞ্জন। সুপ্রিয়া রাজি হয় নি। রাজি হলে বৌদির অনুমান কি সাংঘাতিক সত্য হয়ে দাঁড়াত! ছোট হয়ে পড়ত সুপ্রিয়া। আমার সম্বন্ধে কারো অনুমান সত্য হওয়াই ত আমার ছোট হয়ে যাওয়া—ভাবলে সে।

সন্ধ্যায় এক কাপ চা মাত্র খাওয়া হয়েছে। ক্ষিদে ছিল প্রচুর। মনকে চুপচাপ করিয়ে দিয়ে বরাদ্দ খাবারটুকু নিঃশেষ করে ফেললে সুপ্রিয়া। তাতে মনেরও উপকার আছে জানে সে। ক্ষিদে থাকলে মন সহজ হতে চায় না। এখন সুপ্রিয়ার মনে হল রাস্তায় দাঁড়িয়ে হয়ত তার ক্ষিদেই পেয়েছিল। বুক কেঁপে ওঠার অস্বস্তি নইলে হত না।

দরজা বন্ধ করে জানালাগুলো খুলে যখন বাতি নিভিয়ে দিয়েছে সুপ্রিয়া, তখন দাদার জুতোর আওয়াজ কানে গেল তার। নীচের ঘরে ঠাকুর-চাকরের সাড়াও যেন পাওয়া গেল একটু। দাদার ভাত হয়ত ঢাকা নেই—সুপ্রিয়া ভাবতে ভাবতে বিছানায় এল। তাহলে ঘরে এনে ভাত রাখা তার বাইরে থাকার শাস্তি! না বলে রাত দশটা অবধি বাইরে থাকার শাস্তি। পরিবারে বড় ছোট সবারই শাস্তির ব্যবস্থা থাকে। বড়র বেলায় ওটা বড় হয়ে চোখে ঠেকে না। এম্নি ছোটখাট তাচ্ছিল্যের আয়োজন সাজিয়ে তোলা হয়।

ভেবে খুব মজা পেলে সুপ্রিয়া। চুলগুলো আলগা করে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল। ঘুম আসতে যতক্ষণ দেরি, আজ-

কের এই অনিয়মটা নিয়ে বেশ ভাবা যায়। নিরঞ্জন পুরনো বিষয়, কিন্তু অনিয়মটা নূতন। আসল কথা এই, নূতনের উত্তেজনাতেই ভুগছিল সে বাড়ি ঢোকবার আগে। এই ত স্পষ্ট হয়ে গেল সব। নিজেকে অস্পষ্ট রাখতে চায় না সে। ধন-বিজ্ঞান তার অধ্যাপনার বিষয়, সেখানে কুয়াশার ঠাঁই নেই। নিজের মনেও সে কুয়াশা জমতে দেয় না।

এতক্ষণে হয়ত বৌদি দাদাকে বলেছেন সুপ্রিয়ার নিয়ম-লঙ্ঘনের কথা। নালিশ নয়—খবর দেওয়া। "ভাই-বোন সমান নিশাচর হয়ে উঠলে দেখছি"—এম্নি কোনো কথা। দাদা একটু অবাক হবেন কিন্তু স্বাভাবিকতায় ফিরে আসতে কষ্ট হবে না তাঁর। স্বাবলম্বী, বয়স্ক বোন সম্পর্কে বেশি উদ্বেগ না থাকাই স্বাভাবিক।

কিন্তু মা? শাস্তির একটা মৃদু ব্যবস্থা করলেও উদ্বেগ নিয়েই তিনি ঘুমিয়েছেন। অবিবাহিতা মেয়ে হয়ত মার চোখে সাবালিকা হয় না কস্মিনকালেও। অথচ কি আশ্চর্য, বিবাহিতা হলে কাঁচ বয়সের বেড়াও ভেঙে যায়। তার মানে, মার মনে তখন আর অধিকার-বোধটা কাজ করে না।

কাল ভোরে মাকে কেমন দেখবে তা ভাবতে গিয়ে বেশ একটু উত্তেজনা বোধ করল সুপ্রিয়া। রাত্রির ঠাণ্ডা বাতাস সে উত্তেজনার গায়ে যেন সজীব হয়ে উঠল।

ঘুম আসবে না এখন। আরো খানিকক্ষণ জাগতে হবে।

মার অনুশাসনে ত আমি মানুষ নই—ভাবতে লাগল সুপ্রিয়া —বাবার আদর-যত্নেই মানুষ। নইলে মেয়েলি স্বভাবের দায়ে এই পঁচিশ বছর বয়েসে আস্ত একটি গিন্নি হয়ে উঠত না কি

সে? লেখা-পড়ায় অরুচি এসে যেত কবে, অগতির গতি বিয়ের জন্যে অপেক্ষা করে থাকত মন। আজও নিজের কাছে যতটা ছেলেমানুষ সে ততটা ছেলেমানুষ থাকতে পেরেছে বাবার কাছ-ঘেঁষা ছিল বলেই। বাবা নেই আজ সাত বছর— যতটা বুড়ো হয়েছে সে এই সাত বছরে।

মা খাঁটি গিন্নি। বৌদি অগত্যা তা-ই। এদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে টিকে থাকা যে কত শক্ত মনের কাজ, সুপ্রিয়া ছাড়া তা আর কে বুঝবে? এদিক থেকে দাদা সত্যি ভালোমানুষ—মেয়েরা মেয়েলি থাকবে কি পুরুষালি করবে তা নিয়ে বিশেষ ভাবনা-চিন্তা নেই। সরকারি চাকরি নিয়ে শুধু উপরে ওঠার ভাবনায় পড়ে আছেন। আপন ভাবনা থেকে ছুটি নিলে হয়ত অজস্র মেয়েকে দশটা-পাঁচটা অফিস করতে দেখেন। কাজেই মেয়েদের নিয়ে বিব্রত হওয়া তাঁর ধাতে আসে নি।

কিন্তু খানিকটা বিব্রত হলে সুপ্রিয়া বেশ খুশি হত। দাদার কাছে কোনো সময়ে কোনো কারণেই তার দাঁড়াবার উপায় নেই। কোনো সমস্যার মীমাংসা তাঁর কাছে পাওয়া যাবে না। মানুষের সমস্যা নেই এমন ত নয়। কত খুঁটিনাটি বিষয় আছে যাতে অন্যের সাহায্য পাওয়া দরকার। মেয়েদের ত আরো বেশি। দাদার কাছে কোনো সাহায্যের ভরসা নেই। নিরঞ্জন না থাকলে সত্যি হাঁপিয়ে উঠত সে। বন্ধুরা আছে, কিন্তু তারাও ত মেয়ে। একেক সময় পুরুষের পরামর্শ ছাড়া মন শান্তি পায় না। তখন তার পরম বন্ধু অধ্যাপিকা কুন্তলা শত পরামর্শ দিলেও মন মানবে না। মেয়েদের সম্পর্কে মেয়েরা কি নিরপেক্ষ হতে পারে?

কুন্তলার দূর সম্পর্কের দাদা আর প্রাইভেট টিউটর এই নিরঞ্জন সুপ্রিয়ার জীবনে একটা মস্ত বড় ঘটনা। কুন্তলাদের বাড়িতেই তার সঙ্গে পরিচয়। শক্ত মানুষ। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হতে সময় লাগে নি। শক্ত মানুষ বলেই হয়ত সুপ্রিয়ার তাকে ভালো লেগেছিল।

প্রথম পরিচয়ের দিনেই নিরঞ্জন সুপ্রিয়াকে যা বলেছিল তা মনে রাখবার মত। বলেছিল: "ধনবিজ্ঞান পড়েছেন আর পড়াবেন? যে বিজ্ঞান কোনো আশা দেয় না, দিতে পারে না, তার ধ্যান করে কী লাভ?"

"তার মানে?" সুপ্রিয়ার কণ্ঠ ধারালো হয়ে উঠেছিল।

"ধনবিজ্ঞান কি একটা সমাজের প্রত্যেকটি লোকের আয় বাড়িয়ে দেবার উপায় বলতে পারে? এমন করে বাড়িয়ে দেওয়া যাতে আর চাহিদা থাকবে না?"

"সাম্যবাদী অর্থনীতির কথা যদি ধরেন"—একটু দ্বিধা এসেছিল সুপ্রিয়ার কথায়।

"কিছুই আমি ধরতে চাই নে। বলশেভিক দলের উন্নতি ছাড়া যদি সে অর্থনীতি আর কিছু করে থাকে তার সূত্রটাই আমাকে ধরিয়ে দিন।"

কুন্তলা উপরে পড়ে বলেছিল: "তোমার রাজনীতির আওতায় নিয়ে ফেলছ কেন অর্থনীতিকে, নিরঞ্জনদা?"

"অর্থনীতি রাজনীতিরই পোষা বিজ্ঞান, না কি বলেন মিস্ রায়—" নিরঞ্জন উজ্জ্বল চোখে সুপ্রিয়ার মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

নিরঞ্জন রাজনীতি করত। স্বদেশী যুগে জেল খেটেছে।

এখন খবরের কাগজে সপ্তাহে দুটো স্তম্ভ লিখে কিছু পায়, আর আছে চড়া দামের টিউশনি।

রাজনীতিকে ভয় পায় সুপ্রিয়া—ইস্কুলে পড়বার সময় তার ভীষণ রূপটাই সে দেখেছিল দাঙ্গার দুর্দিনে। কাজেই নিরঞ্জন যখন বলে: "জানো সুপ্রিয়া, আমরা দুজন দুসভ্যতার মানুষ" —সুপ্রিয়া তা নির্বিবাদে মেনে নেয়। অর্থনীতিতে তার রুচি নেই, তবু মাঝে মাঝে সুপ্রিয়াকে খুশি করবার জন্যে অর্থনীতির কুশল জিজ্ঞাসা করে। সুপ্রিয়াও সুযোগ পেলে রাজনীতির খবর জানতে চায়। নিরঞ্জন হেসে বলে : "দেশকে একদিন ভালোবাসতাম। এখন দেখছি অনেকেই ভালোবাসে। আমার ভালোবাসার দাম নেই। তাই সরে দাঁড়িয়েছি।" কথাগুলোতে ব্যথা শুনতে পায় সুপ্রিয়া, তাই চুপ করে থাকে। নিরঞ্জন চুপ করে না, নিজেকে খোলামেলা করে দেয় : "দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে, আমার মত যারা পরাধীন দেশের সেবক তারা ত এখন বেকার!"

সুপ্রিয়া আপন মনেই যেন বলতে চায়: "স্বাধীন দেশের সেবক হওয়া যায় না?"

"শিক্ষা নেই, বয়েস নেই, উপায় জানা নেই।"

"সহজ পথ নেই, না?"

"তা-ই। যা আছে তোমাদের অর্থনীতির দুর্বোধ্য রাস্তা।"

"সেখানে একা চলবার রীতি নেই, তাই মুস্কিল।"

"অথচ আমরা একলা চলতেই শিখেছি।"

"আপনি অসামাজিক।"

"খানিকটা তা-ই।"

নিরঞ্জনের দৃঢ় মুখের চেহারাটা যেন ভেঙেচুরে কোমল হয়ে

যায়। হাসির ঝিলিকে সুপ্রিয়া উজ্জ্বল হয়ে বলে: "নইলে কেউ একা একটা ঘর ভাড়া করে থাকে, হোটেলে খায়?"

নিরঞ্জন ম্লান মুখে হাসতে থাকে। নিজের দুর্বলতা স্বীকার করে তক্ষুনি শক্ত মানুষের ভূমিকায় ফিরে যাওয়া যায় না। সুপ্রিয়া হঠাৎ-ই তখন বলে ফেলে: "আপনার বিয়ে করা উচিত।"

"কেন?" নিরঞ্জন শক্ত হয়ে আসে।

"সামাজিক হতে পারবেন।"

"ও।" হতাশা ফুটে ওঠে নিরঞ্জনের গলায়।

নিরঞ্জনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুপ্রিয়া বয়েসে যেন অনেক নেমে গেছে। বাবার মৃত্যুর পর বয়েসে যতটা বেশি উঠে গিয়েছিল, ততটা নেমে এসেছে সে এখন। বেশ খোলামেলা হতে পারে সে নিরঞ্জনের কাছে। খোলামেলা হতে পারাই ত তারুণ্য।

মনে-মনে কথা বলা শেষ করে চোখ বুঁজে চুপচাপ হয়ে থাকে সুপ্রিয়া। কখন ঘুম এসে যায় জানতে পারে না।

দুই

সুপ্রিয়া বৌদির সঙ্গে বসে চা খাচ্ছিল। মা পাশ ঘেঁষে ঠাকুরের সন্ধানে চলে গেলেন—কথা কইলেন না। হয়ত এম্নি-তেই এ-সময়ে কথা বলেন না কিন্তু সুপ্রিয়া প্রত্যেকটি মুহূর্তে মার কণ্ঠ আশা করছিল বলেই ব্যাপারটা নিয়মের ব্যতিক্রম মনে হল তার কাছে। আর তাই তার পক্ষেও যা ব্যতিক্রম, গম্ভীর হয়ে যাওয়া, তাই হয়ে চলছিল সে ক্রমশ।

বৌদি কথা বললেন : "দিদিভাই, তুমি আয়নায় মুখ দ্যাখো না ক'দিন ?"

সুপ্রিয়া চেষ্টা করে হাসল একটু।

"না, সত্যি বলছি, দ্যাখো মুখ ?"

"কেন ?"

"কী রকম রোগা আর কালসে হয়ে গেছ !"

"রোগা ?" সুপ্রিয়া চোখের উপর বাঁ হাতটা ঘুরিয়ে দেখে নিলে একবার : "কই না ত !"

"জিজ্ঞেস করো মাকে !"

"মানুষের কি রোগা হতে নেই ?"

"আছে। কিন্তু তার জন্যে ভাবনা-ও ত আছে।"

"এত ভাবলে কি আর চলে !"

"এত কেন, তুমি মোটেই ভাবছ না !"

"কী আর করবে ?" চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে পড়ল সুপ্রিয়া : "আমার হয়ে তুমি খুব ভাবতে শুরু করো।"

বৌদির চোখে খানিকটা অভিমান ছলছল করে উঠল। লক্ষ্য করলেও দাঁড়াল না আর সুপ্রিয়া। ঘরে চলে এল। ড্রেসিং আয়নাটার সামনে একটু দাঁড়িয়ে তারপর বই নিয়ে বসে গেল। ক্লাশের পড়াগুলোতে চোখ বুলুতে হবে।

দু'আঙুলে মাথার চুল টেনে টেনে মুদ্রাতত্ত্বে যখন ডুবে গেছে সুপ্রিয়া, মা ঘরে এলেন। সুপ্রিয়া তাকাল না। চলে যাবেন কি না হয়ত একবার ভাবলেন মা, তারপর সুপ্রিয়ার খাটে বসে বললেন: "বিকেলে বেরুলে—রাত ন'টা বেজে গেল আসছ না—আমি ভেবে মরি—"

সুপ্রিয়া বই-এ মুখ রেখেই বললে: "কী ভাবছিলে—অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে?"

"বাঃ—সেদিনও ত বাস উল্টে গেল একটা—"

"উল্টে যদি যায় ত মরব!"

মার মুখে আতঙ্ক ফুটল না, একটু বিরক্তির আভাস দেখা গেল। এবার তিনি সরাসরি প্রশ্ন করলেন: "কোথায় ছিলে? কুন্তলাদের বাড়ি?"

ঘাড় নেড়ে একটা মিথ্যা চালিয়ে দেওয়া যেত; কিন্তু না, তার চাইতে সাহস ভালো। সুপ্রিয়া মার মুখে পুরোপুরি তাকিয়ে বলল: "এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল—কুন্তলারই দূর-সম্পর্ক তিনি।"

মুখখানা এ-পাশ ও-পাশ করলেন মা—তারপর উদাসীন হবার চেষ্টা করে বললেন: "কী করেন ভদ্রলোক? প্রফেসর?"

"না। লেখাপড়া করেন।"

মার আর কিছু শুনবার প্রবৃত্তি ছিল না, আর শুনতেও হল

না তাঁকে। চাকর দোরগোড়ায় এসে বললে, "মা বাজার যেতে হবে!" মা চলে গেলেন বাজার বোঝাতে।

মন্দ্রার বাজারে মন দিলে সুপ্রিয়া।

সদ্য কামানো গালে হাত বুলুতে বুলুতে দাদা সুব্রত এসে ঘরে ঢুকল। উদ্বিগ্ন চোখে তাকাল সুপ্রিয়া।

"তোমার নাকি শরীর ভালো নেই, তোমার বৌদি বললেন—" সুব্রতর কথাটা খুব ফিকে শোনাল।

"তোমাকেও বলেছেন? ডাক্তারের কাছে দৌড়ুলেন না কেন?" সুপ্রিয়া হাসলে।

হাসিতে যোগ দিয়ে সুব্রত বললে: "না, যদি কিছু হয়ে থাকে জিতেন-ডাক্তারকে একটা কল দিই!"

"আমার কিছু হতে যাবে কেন? বৌদির চোখে ঠেকছে আমি রোগা হয়ে গেছি! ওটা ওঁর চোখের দোষ কি না বলো!"

নির্বিকার চলে যেতে যেতে বললে সুব্রত: "রোগা অবশ্য হয়েছ খানিকটা!"

সুপ্রিয়া বিরক্ত হল না। হাতের বালা ওঠা-নামা করিয়ে দেখতে চাইল সত্যি সে রোগা হয়েছে কি-না। দাদা-বৌদির এ-উদ্বেগটুকুতে বেশ আরাম পেল সে মনে।

আলস্য লাগছিল। বইটা বন্ধ করে বিছানায় এসে কাৎ হল। সত্যি, তার একটা অসুখ ত হয়েইছে। কেমন যেন রূঢ় হয়ে পড়ছে সে আজকাল। মা, দাদা-বৌদি কাউকেই আর তেমন ভালো লাগে না। এমন কি এই বাড়িটাও মনে হাঁফ ধরিয়ে দেয়। এই ত অসুখ।

রাসবিহারী এভিনিউতে ছোট দোতলা বাড়ি। জন্মের থেকে

এর সঙ্গে সুপ্রিয়া পরিচিত। পৈতৃক বাড়ি থাকাটা যে কত সুখের, আছে বলেই হয়ত সে তার ধারণা করতে পারে না। শিয়ালদর দৃশ্যটা মনে পড়ে সুপ্রিয়ার। কী সাংঘাতিক অবস্থায় লোক থাকে! আর সে? সুন্দর এই ঘরটাতে একা। ভাবনা নেই, অসুবিধে নেই। তবু কেন একেক সময় দম বন্ধ হয়ে আসে তার? মিথ্যে নয়—স্বাস্থ্য সে হারিয়েছে। অন্তত মনের স্বাস্থ্য। পুরোনো বন্ধনগুলো আলগা হয়ে গেছে। এমন যায় না কি সবার? না, তার বেলায়ই এমন হল!

নূতন বন্ধন একটা আছে অবশ্য। নিরঞ্জন। নূতনের মোহেই যে পুরোনোগুলো রঙছুট হয়েছে তা ত নয়। নিরঞ্জনের সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই সে বাড়ির সঙ্গে ভালোবাসা হারিয়ে ফেলেছিল। মনে পড়ে, এ-বাড়ির নিয়মে শরীরকে সাজিয়ে তোলা ভুলে গিয়েছিল সে। শাড়ির রং, ব্লাউজের নক্সা, জুতোর হিল নিয়ে খুঁৎ খুঁৎ করতে আর মন চাইত না। বৌদি অবাক হয়েছিলেন, মা-ও খুশি হন নি। মনের গতি স্বাভাবিক থাকলে মেয়েরা কি সাজপোষাকে তাচ্ছিল্য দেখায়? হয়ত এমন দুর্ভাবনাই হয়েছিল তাঁদের।

মনের গতি হঠাৎ বাঁক নিল কেন সুপ্রিয়ার কে বলবে? শরীরটাকে সাজিয়ে তোলা অরুচিকর মনে হয়েছিল, তা-ই শুধু সে বলতে পারে। তাকে ভালো কি মন্দ দেখায় এ-কথা ভাবা-ও যে বর্বরতা তা-ই ভেবেছিল সে। হয়ত এমন কেউ ভাবে না। এ-ধরনের ভাবনা ভেবেই আগেকার জীবন হতে বিদায় নেওয়া। আর তাই বাড়ির সঙ্গেও তার বন্ধনটা শিথিল হয়ে পড়েছিল।

সুপ্রিয়া উঠে বসল। ভালো লাগছিল না এসব ভাবতে।

ভালো লাগছিল না নিজেকেই। রূঢ় হওয়ার মত দুর্দশা আর নেই। ঘর থেকে বেরুল সে রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে।

"বৌদি, তুমি সরো ত ভাই, মার ডালনাটা আজ আমিই করে দিচ্ছি—" সুপ্রিয়া বৌদির পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

"তুমি?" বৌদি ফিরে বসে হাসলেন: "তোমার কলেজ নেই?"

"বারোটায়। উঠে এস তুমি। কই, আনাজের ডালা কই?"

"বাজার থেকে আসুক রাসু—" ডালের জলটা পরীক্ষা করে বৌদি উঠে দাঁড়ালেন।

সুপ্রিয়ার উৎসাহে বাধা পড়ল না। উনুনের ধারে ধপ করে বসে বললে: "তুমি ভাগো, ডাল আমি দেখছি!"

"এখন কিছু দেখতে হবে না—এস তুমি।" রোয়াকে চলে এলেন বৌদি।

যাবার কোনো উপক্রমই দেখালে না সুপ্রিয়া। অপর পাশে ব্যস্ত ঠাকুরকে ডেকে বললে: "কাল রাত্তিরে ঝোলটাতে এত জল দিয়েছিলে কেন, বলো ত ঠাকুর—ভেবেছিলে ওটা অম্বল?"

"বৌদিদিমণি ঝোল চান।" ঠাকুর নির্দ্বন্দ্বে বললে।

"ঝোল ত সবাই চান। তা বলে জল ঢালবে প্রাণের আরামে?" ডালের ফেনা কাটতে লাগল সুপ্রিয়া।

রাসু বাজার নিয়ে এল। সুপ্রিয়া অনর্থক চেঁচিয়ে বললে: "আনাজগুলো ধুয়ে তুলিস রাসু!"

আনাজের ঝুলি আলাদা। মাছের ছোঁওয়া লাগে না। ধোওয়ার মানে খুঁজে পেলে না রাসু। তবু বালতি হাতে কলতলায় ছুটল। দিদিমণি যা বদমেজাজী!

সত্যি বলতে আজ সুপ্রিয়ার মেজাজ খুবই ভালো ছিল। একটু বিরক্ত না হয়ে মেয়েদের সে বুঝিয়ে দিতে পারল আমাদের দেশে সবটা টাকা-পয়সা যে লেনদেনের আওতায় আসে না আর তার দরুণ পরিকল্পনা যে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ ক্লাসটা শেষ করেই এক পিরিয়ড ছুটি। অধ্যাপিকাদের বসবার ঘরে ঢুকেই সে দেখতে পেলে তার চেয়ারের পাশে চেয়ার টেনে কুন্তলা বসে আছে। কী ব্যাপার—কুন্তলারও ছুটি না কি এ-পিরিয়ড—ঠিক মনে করতে পারল না সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া এসে বসল। তবু কুন্তলা চুপচাপ।

"ক্লাস নেই তোমার?" সুপ্রিয়াই প্রথম কথা বললে।

"আছে। দু'পিরিয়ড পর।" একটু যেন অন্যমনস্ক কুন্তলা: "চলে এলাম আগেই।"

"নেশা। আমি ত রোববারদিন হাঁফিয়ে উঠি।"

"একটা খবর আছে সুপ্রিয়া—" কুন্তলা চটপটে হতে চেষ্টা করল।

"কী?" কুন্তলার মুখের উপর খবরের শুভাশুভ খুঁজতে লাগল সুপ্রিয়ার চঞ্চল চোখ।

"আমি বিয়ে করছি!"

"বিয়ে?" হাসিতে সুন্দর হয়ে উঠল সুপ্রিয়ার মুখ: "সত্যি? কাকে?"

ঘরে ওরা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই, তবু নিশ্চিন্ত হতে চারদিকে একবার তাকিয়ে নিলে কুন্তলা। তারপর বললে: "একজন এঞ্জিনিয়ারকে।"

"এতদিন চেপে গেছ? কী মেয়ে বাবা তুমি!"

"এতদিন ত পছন্দ আর পাকাদেখার পালা গেল—ও কী আর হৈ-হৈ করে বলে বেড়াবার কিছু?"

"ও।"

"তুমি কী ভেবেছিলে আমি প্রেমে পড়ে বিয়ে করছি?"

"ভাবতে দোষটা কী?"

"আমি আমাকে গল্পের নায়িকা ভাবতে রাজি নই।" কুন্তলা বেশ প্রগল্ভ হয়ে উঠেছিল: "ভাবতে পারো, আমি বিয়ের প্রেমে পড়েছি।"

"মাষ্টারি আর ভালো লাগছে না?" সুপ্রিয়াকে ম্লান দেখালে।

"একদম না। আমি ক্লান্ত।"

"বিয়ের জীবন কী কম ক্লান্তিকর—দেখছি ত আমার বৌদিকে।"

"সে জীবনে ত যাই নি, গিয়ে দেখতে চাই।"

"প্রাণ-ভরে দ্যাখো।" সুপ্রিয়া মুখের মরা হাসিটাকে আবার জীবন্ত করে তুলল: "কিন্তু এঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোককে পাকাপাকি দেখেছ ত?"

"তিনি আমাকে দেখবেন, আমি তাকে দেখব না?"

"পছন্দ হয়েছে?"

"মোটামুটি।"

সুপ্রিয়া গল্প জমাবার ভঙ্গীতে বললে: "যখন বি-এ পরীক্ষা হয়ে গেছে, মা আমার জন্যে এক পাত্র এনে জুটিয়েছিলেন। হাকিম। পাত্র পছন্দ করল আমাকে কিন্তু আমি পছন্দ করতে পারলাম না বেচারীকে।"

"পছন্দ করতে পারো এমন পাত্র জুটাতে পারলেন না আর তাঁরা ?"

"বিয়ে যদি পছন্দ না করি পাত্র পছন্দ করাবেন কি করে ?"

"বিয়ে-বাড়ি পছন্দ করো ত ? তাহলেই আমার হবে!" কুন্তলা নিজের প্রসঙ্গে ফিরে এল।

"শাড়ির রং আর এঁটো পাতার গন্ধ—এই ত বিয়ে-বাড়ি ? দু'টোই আমার অপছন্দ।"

"সুপ্রিয়া, তোমাকে শুচিবাই-তে ধরবে! জীবনটা শুধু শালীনতা নয়—"

"থাক্ মাষ্টারি করতে হবে না— কে না জানে জীবনের মোটামোটা কথা ? তবু মানুষের রুচি থাকা দরকার, পরিচ্ছন্নতা দরকার।"

"তোমার এ-মাষ্টারিরও দরকার নেই—রুচি যার যেমন একটা আছেই আর পরিচ্ছন্নতাও।"

"থাকতে পারে কিন্তু মনের উন্নতি নেই।"

"তা-ও কি এক রাস্তায় চলে ?"

চলে না। সুপ্রিয়া চুপ করে রইল। কুন্তলাকেই ভাবল সে মনে-মনে। একসঙ্গে কাজ করছে, একসঙ্গে ছবি দেখেছে, বেড়িয়েছে তবু একই ধাপে ত দু'জনের মন চলতে পারে নি। তা যদি চলত তাহলে কুন্তলা বিয়ের কনে সাজতে রাজি হত না। কতটা সাধারণ হয়ে গেছে যে কুন্তলা ভাবতেও অবাক লাগে। এ যেন সুপ্রিয়ারও খানিকটা লজ্জা।

"তোমাকে ভাবিয়ে দিলাম দেখা যাচ্ছে।" ঠোঁটে একটু হাসি ছড়াল কুন্তলা।

"ভাবছি স্বাধীনতা খোয়াতে রাজি হলে কী করে?"

"সমাজে থাকাই ত স্বাধীনতা খোয়ানো, আমরা কেউ স্বাধীন না-কি?"

"তবু যতটুকু কিন্তু বিয়ে ত মনের আষ্টেপৃষ্ঠে শেকল জড়িয়ে রাখা।"

"শৃঙ্খলাকে শেকল বলছ না ত!" কুন্তলা হাসির তোড়ে সুপ্রিয়ার সুচিন্তিত মন্তব্যটাকে হাওয়া করে দিতে চাইল।

সুপ্রিয়া মাথা নাড়ল: "যা-ই বলো, কুন্তলা, এ-ধরনের বিয়ে যৌনতার বিজ্ঞাপন।"

"হতে পারে কিন্তু প্রেমে পড়ে বিয়ে করা মূর্খতা।"

"প্রেম যদি কাজ না হয়ে আবেগের ফেনা হয় তাহলে তা-ই।"

"কাজই হোক আর অকাজই হোক প্রেমের পর যারা বিয়ে করে, আমি এমন পঞ্চাশটা উদাহরণ দিতে পারব, তারা কেউ সুখী নয়।"

"জীবন-যাপন করার দায়-দায়িত্ব ভুলে প্রেমই করো আর বিয়েই করো তুমি সুখী হবে না। আবেগ আর যৌনতা জীবন-যাপনের একটা বড় অংশ নয়, এ-কথা ভুলে যাই বলেই যত যন্ত্রণা।" নিজেকে খানিকটা স্পষ্ট করতে পেরে সুপ্রিয়া খুশি-খুশি চোখে কুন্তলার মুখে তাকাল।

কুন্তলাও নিজেকে স্পষ্ট করার জন্যে বললে: "প্রেমের মুহূর্তের মতই যে জীবনের অনেক মুহূর্ত নয়—যারা প্রেমে পড়ে বিয়ে করে তারা এ-কথা ভুলে যায়!"

"তাদের উপর ক্ষেপে গিয়েই তবে তুমি এ-বিয়েতে মত দিয়েছ!"

২

"বিয়ে ত দু' ধরনেরই আছে—একটা বাদ দিলে অপর ছাড়া গতি কী ?"

"খুব ভালো।" ঠোঁট টিপে হাসল সুপ্রিয়া : "কিন্তু মেয়েদের ইতিহাস পড়ানোটা ছেড়ে দেবে কেন ? ওটাও কী ভাবী কর্তার নির্দেশ ?"

"নিজের ইতিহাসই রচনা করব, তাই। কর্তার নির্দেশ হবে কেন ?"

"সাবধান, সে-ইতিহাসে ডাইভোর্সের অধ্যায় যেন না থাকে !"

"একঘেয়ে বিবাহিত জীবনে সন্তান হওয়ার মতই ত ডাইভোর্স একটা উত্তেজক ঘটনা !"

"তাহলে ডাইভোর্স মনে রেখেই বিয়ে করছ !"

"বিয়ে মনে রেখেই বিয়ে করছি—পরেকার ইতিহাস কে ভাবে !"

তার মানে কুন্তলার জীবনে প্ল্যানিং-এর কোনো দাম নেই। পড়াশুনো অনর্থক, পড়াতে আসা অনর্থক, বিয়েটাও অনর্থক হবে কি না কে জানে! আসলে ও নিজেকে বুঝতে পারছে না। নিয়তির হাতেই ছেড়ে দিয়েছে সব। সুখী হোক কুন্তলা !

কুন্তলার মুখে গাম্ভীর্যের বিষণ্ণতা ফুটে উঠল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস তুলে অপলক তাকিয়ে রইল সুপ্রিয়ার মুখের দিকে। মুখে কি সুপ্রিয়ার একটু ক্লান্তি নেই, ঠোঁটের রেখায় অবসাদ ? আছে। কুন্তলা ঠিক ধরতে পারছে। কাঠ দিয়ে গড়া মেয়ে সুপ্রিয়া নয়, যেমন প্রিন্সিপালকে দেখলে মনে হয়। তবে কুন্তলার ধরনের তৈরী নয়। নিজেকে নিয়ে অনেক বেশি খুশি সুপ্রিয়া কিন্তু কুন্তলা নিজেকে নিয়ে খুশি থাকতে পারছে না। চেষ্টা

করেছিল। ব্যর্থ হয়েছে।

মৃদু মৃদু হাসছিল সুপ্রিয়া, কুন্তলা চোখের দৃষ্টি সরিয়ে বললে: "ক্লান্তি যে তোমারও আসবে না একদিন, কে বলতে পারে!"

"আসবে।" জোর দিয়ে বললে সুপ্রিয়া: "কিন্তু তোমার পথে গিয়ে তার সমাধান করব না।"

"কথাটা ছেলেমানুষের মত শোনাচ্ছে সুপ্রিয়া!"

"তা শোনালেই যে তার দাম কমে যাবে তা ত নয়!"

"দাম কমে যায়। ইচ্ছে করলেই তুমি ছেলেমানুষ থাকতে পারো না—মেয়ে বলেই পারো না।"

সুপ্রিয়া দু'হাত মেলে দিয়ে বললে: "পারি। সব পারি। পারি নে কথাটা মনকে শোনাতে নেই।"

কুন্তলাও ঘাড় দুলিয়ে বলল: "দেখব, দেখব।"

বাড়ি ফেরার পথে বাসের দুর্দান্ত ভিড়েও সুপ্রিয়ার আজ মনে হল সে যেন একা। কুন্তলা যেন একটা বড় শপথ ভেঙে পেছনে হটে গেল। কিন্তু কী যে সে শপথ তার চেহারাটা আঁকতে পারছে না সে। শুধু অনুভব করছে, তা মহৎ।

"ঊনিশ শতকের এক ফরাসী সাংবাদিক মেয়েদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছিলেন এই বলে: ইংরেজ মেয়ে ঘোড়ায় চড়ে, আমেরিকার মেয়ে ফষ্টিনষ্টি করে বেড়ায়, ফরাসী মেয়ের প্রসাধনে মন, জার্মান মেয়ের মনোযোগ রান্নায় আর দর্শন চর্চায়, ইতালীর মেয়ে প্রেমে আর ধর্মে দোটানা। তুমি কাকে পছন্দ করো, সুপ্রিয়া?"

নিরঞ্জন বলেছিল।

সুপ্রিয়া অবিলম্বে উত্তর দিয়েছিল: "জার্মান মেয়ে।"

কুন্তলা হয়ত ইতালীর মেয়েকে তারিফ করত।

শুনে মা খুশি। বললেন, "যাক্ সুমতি হল তবে মেয়ের!"

বৌদি হাততালি দিলেন। "কুন্তলার বিয়ে!"

সুপ্রিয়া ঘাড় বাঁকিয়ে বললে: "খুব আনন্দ তোমার বৌদি—তোমার দলে আরেকজন ভিড়ল!"

"আনন্দ আর কোথায়—তুমি না ভিড়লে!"

"পাত্র জুটিয়ে দাও, ভিড়ব!" সুপ্রিয়া মার দিকে তাকাল: "তোমার সেই হাকিম পাত্রটি আছে না-কি মা? বিয়ে করলে আমায় বিলেত পাঠাবে?"

"বিয়ের পর ছেলে আর মেয়ে কতোই ত আজকাল বিলেত যায়!" মা নিস্পৃহ গলায় বললেন।

"বিলেত থেকে এসে অবশ্য ওকে আমি ডাইভোর্সও করতে পারি!" কলকলিয়ে উঠল সুপ্রিয়া।

"শুনলে কথা ওর?" মা বৌমার দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

"কথাটা খারাপ হল? বিলেতে, ধরো, কারো সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল—তখন?"

"ওর কেচ্ছা তুমিই শোনো বৌমা—" মা তাঁর ঘরে চলে গেলেন।

সুপ্রিয়া তার চেয়ারে দু'পা তুলে গুটিশুটি হয়ে বসে বললে: "কুন্তলাকে কী প্রেজেন্ট দেওয়া যায় বলো ত বৌদি!"

"শাড়ি। ভালো একটা শাড়ি দিলে হয় না?"

"আমি ভাবছি চন্দনকাঠের একটা বাক্স। গয়না রাখবে। বিয়ে মানেই ত গয়না!"

হাত-ভরা চুড়ি নিয়ে বৌদি হয়ত একটু বিব্রত হলেন কিন্তু বললেন: "বিয়ে মানে যে কী তুমি তার কী বুঝবে?"

"তোমাকে দেখেও বুঝতে পারি নে?"

"না—ও দেখে বোঝার নয়।"

"জিজ্ঞেস করে ত বোঝা যায়! আচ্ছা বৌদি তোমার ডাইভোর্সে ইচ্ছে যায় না!"

"তুমি রীতিমতো ক্ষেপে গেছ দিদিভাই!"

"আমি ক্ষেপতে পারি। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও তোমার মনে যন্ত্রণা নেই?"

"থাকলই বা। তার জন্যে ডাইভোর্স ভাবতে হবে?"

"স্বামী যদি মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়, অনেকে ভাবে।"

"তুমি দেখেছ?"

"আমি হলে ত ভাবতাম।"

"মাথাই নেই তোমার আবার মাথার যন্ত্রণা!" বৌদি হাসতে লাগলেন।

"কুন্তলার ত মাথা গজাতে যাচ্ছে—দেখবে না কতো আনন্দ!" একটু চুপচাপ থেকে সুপ্রিয়া বলে: "বিয়ে করে কেউ সুখী হতে পারে না। যারা বলে সুখী তারা মিথ্যেবাদী।"

"কেউ ত বলে না। সুখ ছাড়াও ত কথা আছে। শুধু সুখই পেতে হবে এমন ভোগী কেন তুমি?"

"ভোগীর কথা ত নয়। দুঃখ না চাওয়া মানুষের লক্ষণ।"

"বেশি ভাবতে গেলেই দুঃখ। ভাবনাটা ছেড়ে দাও।"

"এবং বিয়ে কর। না?"

"নিশ্চয়।"

"আমাদের মতো গরিব দেশে অর্ধেক লোকের বিয়ে না করা উচিত, তা জানো?"

"তোমার ক্লাসের মেয়েদের বোঝাতে পেরেছ ত এ-কথা?"

"না ঠাট্টা নয়, সত্যি বলছি। অশিক্ষিতকে এ-কথা বোঝান যাবে না—এ-দায় বইতে হবে শিক্ষিত লোকদের।"

"তাহলে তুমি অর্থনীতির দায় পালন করছ?"

"অর্থনীতির দিক থেকে আমার কাজের সমর্থন পাচ্ছি।"

"যেদিন শরীরের সমর্থন পাবে না সেদিন বুঝবে।"

"পরীক্ষা করে দেখা যাক না।"

"এ-পরীক্ষায় আর ফার্স্টক্লাশ পেতে হয় না।"

"না হয় থার্ডক্লাশই পেলাম—" আড়মোড়া ভাঙল সুপ্রিয়া, হাই তুলল: "তুমি এখন যাও ত—আমি শোব।"

বৌদি যেতে যেতে হাসলেন, বললেন: "ফেল্।"

সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। এ-সময়টাতে পড়ায় ডুবে যায় সুপ্রিয়া। ক্লাসের পড়া নয়। একটা থিসিসের নোট জমায়। কিন্তু আলস্য যেন ভেঙে দিচ্ছে শরীর।

বাতি নিভিয়ে খাটে চলে এলো সুপ্রিয়া, গা এলিয়ে দিল।

বৌদি মিথ্যে বলেন নি। শরীর নষ্ট হতে পারে। শরীর-বিজ্ঞানের উপদেশ তার জানা আছে। এই এক বছরেই ত কতো রোগা হয়ে গেছে সে। প্রথম পরিচয়ের দিনে কুন্তলা তাকে দেখে বলেছিল: গুপ্তযুগের ভাস্কর্য! কোন মন্দির থেকে নেমে

এসেছে বলো ত! যদিও তেমন কিছু মাংসল গড়ন তার নয় তবু কুন্তলার তারিফের সীমা ছিল না। সত্যি বলতে, স্বাস্থ্য ভালো ছিল তার কলেজে পড়ার সময়টাতে।

কতোদিন হয়ে গেল! কিন্তু মনে হয় এইত মাত্র সেদিন সে ফার্স্টইয়ারে পড়ত। তার নিজের মুখ, সঙ্গে যারা পড়ত তাদের অনেকের মুখ, প্রোফেসরদের মুখ হুবহু তার মনে আছে। আর হেনাকে? মনে-মনে হেসে উঠল সুপ্রিয়া। এই খাটেই ত—এই খাটে শুয়ে কী কান্ডটাই না করে গেল একদিন হেনা।

খুব ভালোবাসত হেনা তাকে। একটু কালো রং, লম্বা ছিপছিপে গড়ন, বড়ো চোখ, পাৎলা ঠোঁট, মিষ্টি হাসি। গা ছুঁয়ে কথা বলত না। এমন কথাও বলত না যা জীবনে ওর কাছেই প্রথম শুনেছে সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া যায় নি। দাদা বন্ধুদের সঙ্গে জুটে পিকনিকে গেছেন। সুপ্রিয়াকেও যেতে বলেছিলেন কিন্তু হেনা আড্ডা দিতে আসবে, সুপ্রিয়া যায় নি। দাদা বন্ধুদের সঙ্গে জুটে পিকনিকে গেছেন। নীচে ঠাকুর-চাকর পাহারা—উপরে সুপ্রিয়া একা, এই খাটে শুয়ে মাসিক পত্রিকা পড়ছে।

হেনা এলো ঘাম মুছতে মুছতে। ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে বললে: "শুনলাম সবাই বাইরে। বাঁচা গেলো বাবা, মনের সুখে কথা বলা যাবে।"

তারপরই ধুপ করে বিছানায় সুপ্রিয়ার পাশে শুয়ে পড়ল হেনা। বললে: "সব চাইতে আরাম শুয়ে শুয়ে গল্প করা।"

সুপ্রিয়া নিজেকে একটু সরিয়ে নিয়ে বললে: "দ্যাখ্, তুই আসবি বলে দক্ষিণেশ্বর যাওয়া বাতিল করে দিলাম!"

সুপ্রিয়ার একটা হাত নিজের হাতে টেনে নিয়ে হেনা আদর মাখিয়ে বললে: "করবিই ত—তুই আমায় ভালোবাসিস যে!"

"আমি? তোকে? মোটেও না।" হাত ছাড়িয়ে নিলে সুপ্রিয়া।

"বটে? ঈস।"

এবার দু'টো হাত টেনে নিলে হেনা ওর দু'হাতে—মুখোমুখি হতে বাধ্য হল সুপ্রিয়া। আর তক্ষুণি সুপ্রিয়াকে জড়িয়ে ধরে হেনা তার ঠোঁটে চুমুর বৃষ্টি ঝরাতে শুরু করলে।

সমস্ত শরীর শির-শির করে উঠল সুপ্রিয়ার—মনে হল হেনার শরীরের চাপে সে বুঝি ভেঙেচুরে যাবে। কিন্তু না—ছিটকে সরে আসতে পারল সুপ্রিয়া। সুপ্রিয়াকে ছেড়ে দিয়ে হেনা খিল-খিল করে হেসে উঠল।

মনে পড়ে, সেদিন আত্মহারা হয়ে হেনা চারটে অবধি বকবক করেছিল। পুরুষগুলোকে যে সে দুচোখে দেখতে পারে না বারবার এ-কথাটাই শুনতে হয়েছিল সুপ্রিয়াকে। সুপ্রিয়া কথা বলে নি বেশি। অপরাধীর মন নিয়ে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছিল সে সবসময়।

অনেকদিন পর আজ ঘটনাটা মনে পড়ছে। কুন্তলার বিয়ের আলাপের ফলেই হয়ত। শরীর সম্পর্কে যখনই সচেতন হতে হয় সুপ্রিয়াকে, তখনই হেনার এই অদ্ভুত কাণ্ডটা মনে পড়ে। এ যদি হেনা না হয়ে কোনো পুরুষ হত, তাহলে কী ভীষণ অপমানিতই না বোধ করত সুপ্রিয়া। এ-বোধের কী মানে হয়? কিন্তু মানে না হলেও এ-বোধ সুপ্রিয়া উড়িয়ে দিতে পারছে না। সম্মানের উপর একটা কুসংস্কারই জন্মে গেছে সুপ্রিয়ার।
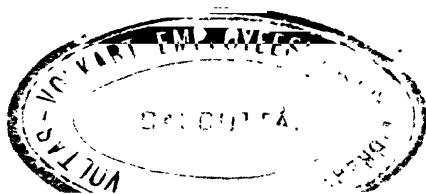
বাড়িতে কোনোদিন সে অপমান পায় নি। এজন্য সবার প্রতি সে কৃতজ্ঞ। বাড়িতে অপমানিত হতে থাকলে তার চরিত্রও কী হত বলা যায় না। আজ মিথ্যে বলতে তার মুখে বাধে কিন্তু তখন হয়ত অনায়াসে মিথ্যে বলে যেতে পারত। সম্ভ্রম গড়ে তোলায় নিজের হাত যতোটুকু আত্মীয়স্বজনের হাত তার চেয়ে একটুও কম নয়।

অন্ধকারেই মা এসে ঘরে ঢুকলেন: "ঘুমুলে?"

"না, বোসো। আলো জেবলো না কিন্তু। অন্ধকারটা চোখে বেশ ঠাণ্ডা লাগছে!"

"দিনরাত বই-এ মুখ গুঁজে থাকলে চোখে আর কতো সয়!" মা চেয়ারে বসলেন।

"কোথায় পড়তে পারছি—এক ফোঁটা পড়া হচ্ছে না আমার।"

"যা হয়েছে ঢের হয়েছে। কুন্তলাকে দেখলে ত—লক্ষ্মী মেয়ে!"

"আর আমি বুঝি অলক্ষ্মী?"

"সেকেলে মানুষরা ত তা-ই বলবে।"

"তুমি ত আর সেকেলে নও!"

মা নিঝুম হয়ে রইলেন। সুপ্রিয়া জানালা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। পাশের বাড়ির ফাঁকে খানিকটা আকাশ, দু'একটা নারকেলগাছের মাথা দেখা যায়। ধূসর রঙটা কেমন যেন অস্বস্তিকর। তারই ভবিষ্যতের রঙের মতো যেন। চোখ ফিরিয়ে এনে সুপ্রিয়া মার ছায়ামূর্তির দিকে তাকায়। কুন্তলাকেই ভাবছেন মা বিকেল থেকে। সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রিয়ারও ভবিষ্যৎ ভাবছেন।

"কুন্তলার ভাই না কে হয় বলেছিলে—ছেলেটি কেমন?" অনেক সঙ্কোচ কাটিয়ে মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলেন মা।

"ছেলে?" সুপ্রিয়া বেশ হাল্কাভাবে বলতে পারল: "বয়েস তার চল্লিশ হয়ে গেছে!"

"চল্লিশ!" ক্ষীণতর শোনাল মার গলা।

"চল্লিশ আর বেশি কী? জানো ত আজকাল লোক আগেকার চাইতে ঢের বেশি বাঁচে? চল্লিশকে দেখলে কী আর চল্লিশের মতো মনে হয়? তোমার ত ষাট হল কিন্তু বলবে কেউ পঞ্চাশের বেশি?" কথা বলে মাকে বিভ্রান্ত করে দিতে চাইল সুপ্রিয়া।

"আমাকে দেখলে সত্তর বলবে—চিন্তায় চিন্তায় আমার আর আছে কী?"

"তোমার চিন্তাটা কোন জায়গায় বলতে পারো?"

"তোমার কিছু হল না—"

"বিয়ে হলেই একটা কিছু হয়ে যেতো? বিয়েতে যে টাকাটা খরচ করতে তাতে আমার বিলেতের পড়াশুনো হয়ে যাবে। তখন দেখবে কিছু হয় কি না!"

মা যেন সত্যি আজ নেতিয়ে পড়েছেন, বললেন: "আমার আর ভালো কী বলো—তোমার বিয়ে হল না—সুবুর বাচ্চা-কাচ্চা কিচ্ছু হল না!"

সুপ্রিয়া জোরে জোরে হেসে উঠল: "অর্থনীতি ত বুঝবে না—পরিকল্পনার যুগে মানুষের ছেলেপুলে কম হয়!"

"কী জানি বাপু—" মার গলা একটু চড়ে গেল: "কিচ্ছু আমার ভালো লাগে না—আমি এখন যেতে পারলেই বাঁচি!"

"তুমি যাবে? আরো পঁচিশ বছর তুমি আছো!"

"হে', পঁচিশ বছর থেকে তোমাদের ছটফট করে মরতে দেখি আর কি!"

"আমি ছটফট করছি?"

"করছ না, করবে।"

"তুমি অভিশাপ দিচ্ছ বুঝি?"

"অভিশাপ দেব কেন?" মা আবার নিস্তেজ শোনালেন: "বিয়ে না করলে মেয়েদের মেজাজ বিগড়ে যায়।"

"আমার মেজাজ ত ক্রমে ভালো হচ্ছে।"

"দিন দিন শুকিয়ে উঠছ!"

"মাংসের ঢেলা ছিলাম—এখন ত বেশ হাল্কা হয়ে গেছি!"

"নিজের খারাপটা যখন দেখতে পাও না, আমি আর কী বলব!"

"খারাপটা কোথায় দেখলে বলো না!"

"খারাপ আর কোথায়—স্বাস্থ্য মেনে চলছ না।"

"গত পাঁচ বছরে কী অসুখটা আমার হয়েছে?"

"হবে। অনেক অসুখই হবে। জিতেন-ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করো।"

"জিতেনবাবু বুঝি বলে গেছেন! বৌদিকে দেখতে এসে আমার রোগের চিন্তা করতে তাঁকে নিষেধ করো।"

"তিনি বলবেন কেন? আমি জানিনে মেয়েদের কিসে কী হয়?" মা বিরক্ত হলেন।

"ও, তুমি জানো! তেমন ত আমিও জানি।"

"জানো, কিন্তু দুঃখ যে পাবে তা জানো না।"

"বিয়ে করলে যে দুঃখ পাবো না, সে গ্যারাণ্টি তুমি দিতে

পারো ?”

“বিয়েতে সুখও আছে।”

মা যে সুখের কথা বলছেন তা নিয়ে আর ঘাটাতে চাইল না সুপ্রিয়া। চুপ করে রইল। বৌদির ঘর থেকে রেডিওর গান মৃদু ধ্বনিতে ভেসে আসছে। ভাগ্যিস কথাগুলো শোনা যায় না! যে-সব কথা বলতে বা শুনতে লজ্জা করে তা-ই গানের কথা হয়—বৌদি যে কী করে শোনেন এ-সব গান!

মাকে ভুলতে চাইল সুপ্রিয়া। মাও নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বিয়েতে সুখ আছে! সুপ্রিয়ার ইচ্ছা হচ্ছিল রত্নার কাহিনীটা মাকে শুনিয়ে দেয়। মা বড্ড বেশি ব্যথা পাবেন তাই সে সামলে গেল। কাহিনীটা অবশ্য হেনার মুখে শোনা —কিন্তু মিথ্যা না-ও হতে পারে।

রত্নার হাবভাব দেখে ম্যাট্রিকের পরই তার বাবা বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। খুব ফূর্তি রত্নার। বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু ছ'মাস না যেতেই বরের হল টি-বি। বরের বন্ধু ছিলেন ডাক্তার। অনবরত তাঁর যাতায়াত চলল বাড়িতে। রত্নার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলেন তিনি। স্বামীর সঙ্গে রত্নার মেলামেশা বন্ধ— কিন্তু রত্না দ্বিতীয় স্বামী হিসেবে পেলে ডাক্তারকে। বিয়ের সুখের স্বাদ থেকে রত্না নিজেকে বঞ্চিত করতে চাইল না।

রত্নাকে দোষী করতে চায় না সুপ্রিয়া। মা যে সুখের ইঙ্গিত দিলেন তা বাঁধ ভেঙে অনেক দূর গড়াতে পারে। তেমন একটি উদাহরণই রত্নার কাহিনী।

বিয়ে সংযমের বাঁধ ভেঙে দেয়। তারপর তুমি কোথায়

গিয়ে পৌঁছুবে তা জানো না। এ-অবস্থাটা সুপ্রিয়ার অসহ্য ঠেকে। শৃঙ্খলা যেখানে নেই সেখানেই তার ভয়।

বৌদির ঘরে গান বন্ধ হয়েছে। সেতার বাজছে। কান পেতে শোনবার মতো। কথা নেই। সে-ই ত এক পরম আরাম।

সে সুখী নয় কে বললে? নিরিবিলি অন্ধকারে ডুবে একটা সুর শুনছে—কোনো দুঃখ নেই, মাতাল স্বামীর কদর্যতা নেই, দুশ্চরিত্র স্বামীর অপমান নেই, উদাসীন স্বামীর নির্যাতন নেই, ডাইভোর্সের ভাবনা নেই, বৈধব্যের দুশ্চিন্তা নেই—কী চমৎকার মুক্তি!

নিরঞ্জন একদিন জিজ্ঞেস করেছিল: "মুক্তিটা কেন, সুপ্রিয়া?"

"আমি যা হতে চাই তা হবার জন্যে।" সুপ্রিয়া উত্তর দিতে একটু দ্বিধা করে নি।

"কী তুমি হতে চাও?"

"মানুষকে আমি জানতে চাই—শুধু আমার দেশের মানুষকেই নয়—নানা ভাঙাগড়ার ভেতর দিয়ে দেশে-দেশে যে ছেলে-মেয়ে তৈরী হচ্ছে তা দেখে আমি বুঝতে চাই আমাদের কী হওয়া উচিত!"

"যেখানে সব চাইতে বেশি ভাঙাগড়া সে-সোভিয়েট রাজ্যে গিয়েও শুনবে: Girls should be attractive."

"তারা লোকসংখ্যা বাড়াতে চায়।"

"কাজেই মুক্তি কোথায়? সমাজ না-হয় রাষ্ট্র তোমাকে বাঁধবেই।"

"আমার মুক্তি আমার ভেতর।"

আমরাও ভাবতাম—যখন প্রাচীনদের সঙ্গে লড়েছি—পরিবারে ভাঙন ধরিয়েছি—নিজের ভেতরকার মুক্তির আনন্দে দেশের মুক্তির ছবি যখন দেখতাম।"

"এখন ত আরো বেশি মুক্তির পথে আমরা—"

"জীবন পঙ্গু হয়ে গেলে মুক্তির পথ মুক্তি দেখায় না।"

পঙ্গু জীবন সুপ্রিয়ার অনুভবের বাইরে। সে তাই চুপ করে গিয়েছিল।

জীবনকে পঙ্গু করে দেয় দারিদ্র্য, যৌনতা, বয়েস, অসুস্থতা। নিরঞ্জন কী ভাবছিল সুপ্রিয়া তা জানে না। আন্দাজ করে নেবার ইচ্ছাও তার ছিল না। তার চোখে জীবন সুন্দর—উপভোগ করবার মতো। দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেলেই হল। জীবন সুন্দর হয়ে উঠবে।

কিন্তু আজ সে ভাবছে মনের দারিদ্র্যের কথা। যৌনজীবনকে একসময় রাশিয়ার মেয়েরা একগ্লাস জল খাওয়ার মতো ভাবত। এ-কি মুক্তি—না মনের দারিদ্র্য ? দেহের জীবন ভাবনার বাইরে ফেলে রাখতে চায় সুপ্রিয়া। জানে না তাতে মুক্তির স্বাদ ঘোলাটে হবে কি না, মন দরিদ্র হয়ে পড়বে কি না। ওরকম রাশিয়ার মেয়ের ঠিক উল্টো ভঙ্গী—এতেও ত জীবন পঙ্গু হতে পারে। নিরঞ্জন হয়ত এ-পঙ্গুতাই অনুভব করছে। তার অনুভবের সময় আসে নি।

কিন্তু এমনও ত হতে পারে যে নিরঞ্জন কোনো আদর্শের নাগাল পায় নি বলেই নিজেকে পঙ্গু ভাবছে। তা-ই হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সুপ্রিয়া আজ এ-সব ছেড়ে অন্য কিছু ভাবতে পারছে না কেন ? কুন্তলার বিয়ের দুঃসংবাদেরই তাড়নায়। ছিঃ !

নিজেকে আবিষ্কার করে দুঃখিত হল সে। উঠে বাতি জ্বালল। পড়ার নিয়মিত কাজ থেকে ছুটি নিলেই যতো বিপদ, ভাবলে সুপ্রিয়া। সেল্‌ফ থেকে অধ্যাপিকা রবিনসনের একটা বই টেনে নিয়ে সম্পদ, আয়, পুঁজি, বিনিয়োগের চরিত্রে ডুবে গেল।

আজ টিউশনি নেই। খবরের কাগজের জন্যে একটা লেখা তৈরীতে মন দেবে ভাবছিল নিরঞ্জন।

ওয়েলিংটন স্ট্রীটে দোতলায় ছোট একটি ঘর। রাস্তার গোলমাল আসে প্রচুর। তা ভুলেও তাকে লিখতে হয়। গোলমাল কানে নিয়ে লেখার অভ্যাস হয়ে গেছে তার। এই ত নাগরিক জীবন। লেখাও ত তার নাগরিক জীবনের তথ্য নিয়ে —সাহিত্য সৃষ্টি করে না সে। বলতে কি, নিরিবিলি জায়গায় হাঁফিয়ে ওঠে তার মন। ছোট ঘরটাতে আর কেউ নেই, এটুকু নিরিবিলিই ত যথেষ্ট!

পুরনো ঘর। আলো-হাওয়া তেমন নেই। কিন্তু পরিচ্ছন্ন একটা ছোট টেবিল, দুটো চেয়ার, ছোট বিছানা—এক কোণে স্যুটকেশ, আরেক কোণে একটা স্টোভ, কুঁজো আর চায়ের বাসনকোসন। মেঝেতে জায়গা খুবই কম। সে জায়গাটুকুই সে নিজ হাতে ঘসে ঘসে রোজ পরিষ্কার করে—টেবিলের কাগজপত্র, আয়না-চিরুণী, পেস্ট-টুথব্রাশ, সেফটিরেজার ছিমছাম করে রাখে। তেমনি চায়ের কেৎলী-কাপ—ধোওয়া-মোছা, পরিষ্কার। সুপ্রিয়া একদিন বলেছিল: "টেবিল গোছাবার ভার যে কোনো মেয়ের উপর ফেলে রাখেন নি, তার জন্যে ধন্যবাদ।" নিরঞ্জন বলেছে: "বোকা নায়িকার দিন যে আর নেই তা আমি জানি!"

টেবিলে বসলেই কথাটা মনে পড়ে নিরঞ্জনের। তার জীবনে হয়ত এমনই একটি মেয়ের দরকার যে আবেগে গলে পড়ে না।

সে ভাবে, স্বদেশী জীবনের পর পুরোপুরি সে আবেগকে বিসর্জন করতে পেরেছে। কলকাতার যান্ত্রিক জীবনে তাই খুশি। আবেগহীন নাগরিক জীবন গত নির্বাচনে যে মনোভঙ্গী প্রকাশ করেছে তা নিয়েই এখন মনে-মনে লেখাটা তৈরী করে চলেছিল নিরঞ্জন। সুপ্রিয়ার খানিকটা সাহায্য পেয়েছে সে বিষয়টাতে। নাগরিক অর্থনীতির একটা সম্পূর্ণ ছবি সুপ্রিয়া সেদিন তাকে দিয়ে গেছে। তবু, বিকেল হতে চলল, একটা শিলপের বেশি লেখা হয় নি। অন্তত আটটা শিলপ লিখতে হবে। ইংরেজীর উঁচু ডিগ্রী আজ আর তাকে এগিয়ে দিতে পারছিল না। এমন তো কোনো লেখার বেলায় হয় না। সুপ্রিয়ার মুখে শোনা কথা লিখতে হচ্ছে বলেই কি বাধা দিচ্ছে তার মন? পৌরুষের বাধা? আত্মসম্মানের বাধা?

হয়ত সব কিছু। নিরঞ্জন নিজের উপর বিরক্ত হয়ে উঠল। সে বুদ্ধি দিয়ে বাঁচতে চায় কিন্তু আগেকার জীবনের আবর্জনা তার মন ঘোলাটে করে তোলে। স্বাধীনতার যুগে সে অনায়াসে শ্বাস নিতে পারছে না। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল নিরঞ্জন।

সিঁড়িতে স্যাণ্ডেলের শব্দ। কে? খবরের কাগজের সহকারী-সম্পাদক বন্ধু নির্মল? হবে বা।

দরজায় এগিয়ে গেল নিরঞ্জন। কিন্তু নির্মল কোথায়, এ যে রেবা!

"রেবা?" একটু অবাক হল নিরঞ্জন, আবার সহজ হয়ে গেল তক্ষুণি: "এসো।"

মুখের সঙ্কোচভাবটা কাটিয়ে ঘরে এলো রেবা। আঁচলটি টেনে কপালের আর ঠোঁটের উপরকার ঘাম মুছল। মিলের

আধ-ময়লা রঙীন শাড়িটার দিকে এক পলক তাকিয়ে বললে:

"স্কুল করি নি। বাড়ি থেকে সোজা চলে এলাম।"

"বোসো।" নিরঞ্জন থুতনি উঁচিয়ে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলে।

রেবা চেয়ারে বসে একটু হাসতে চেষ্টা করল।

নিরঞ্জন বিছানায় এসে বললে: "অনেকদিন পরে ত এলে। খবর কি বলো!"

"খবর!" রেবার মুখে আবার সংকোচ: "মার অসুখ। পেটে ব্যথা—খেতে পারেন না।"

"কে দেখছে?" নিরঞ্জন রেবার মুখোমুখি।

"কেউ না। কিন্তু ডাক্তার দেখাতেই হবে।" রেবা শাড়িটা টেনে পা ঢেকে দিলে।

"টাকা?" নিরঞ্জন উঠে দাঁড়াল: "কতো লাগবে?"

"তা ত জানিনে—আমার হাতে টাকা নেই—" অসহায় হাসি হাসল রেবা।

নিরঞ্জন স্যুটকেশ খুলে তার পকেট থেকে দুটো দশ টাকার নোট বার করে আনলে।

"এই নাও এখন, না যদি কুলোয় এসো আবার।" নিরঞ্জন আবার বিছানায়।

নোটগুলো ভাঁজ করে হাতের মুঠোয় নিয়ে রেবা তেম্নি হেসে বললে: "আপনাকে এসে বিরক্ত করি কিন্তু কী করব বাজে একটা পয়সা খরচ করতে হলে হাত না পেতে উপায় নেই—"

"এ-কথাটা কি আমাকে বুঝিয়ে না বললেই নয়?" কেমন
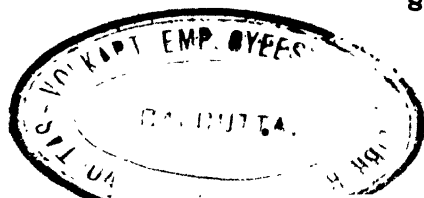
যেন একটা অস্থিরতা বোধ করছে নিরঞ্জন।

"বুঝিয়ে বলার কিছু নেই কিন্তু খারাপ ত লাগে—" রেবার গলা বোঁজা-বোঁজা।

"খারাপ লাগার কী আছে—আমি ত বলেছি দরকার হলে আসবে—আমার যা সাধ্য দেব।"

রেবা কিছু বললে না—মুখ নীচু করে আঁচলটা চোখের উপর টেনে নিল। যেখানে ঘামের জলের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা চোখের জল মিশে গেছে।

"এ তোমার অন্যায়, রেবা!" নিরঞ্জন নিরুপায় হয়ে বললে।

"না, কিছু না।" চোখ মুছে রেবা নিরঞ্জনের দিকে তাকাল।

সিঁড়িতে আবার জুতোর শব্দ। মৃদু আর ধীর। নিরঞ্জনের চোখে একটু আশঙ্কা। সুপ্রিয়া। সে জানে, সুপ্রিয়া ছাড়া কেউ নয়।

রেবা উঠতে যাচ্ছিল। নিরঞ্জন বললে: "বোসো।"

সুপ্রিয়া ঘরে এলো। কলেজ ফেরত। হাতে বই আর ব্যাগ, পায়ে ক্লান্তি।

"আমি ডিসটার্ব করলাম না ত?" সুপ্রিয়া ওদের দুজনের মুখেই হাসি বুলিয়ে দিলে।

"না না—বোসো।" হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল নিরঞ্জন: "তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। এই রেবা—টীচারি করে—আমার এক বন্ধুর বোন। আর রেবা, এ হল সুপ্রিয়া রায়—কলেজে ইকনমিক্স পড়ান। তোমরা একই লাইনে আছ। বেশ আলাপ জমাতে পারবে আশা করি।"

খালি চেয়ারটাতে বসে সুপ্রিয়া বললে: "আপনি কোথায় কাজ করেন?"

"যাদবপুরে।" রেবা সুপ্রিয়াকে চোখের পরীক্ষায় এনে হাসল একটু: "কিন্তু আপনি আমাকে আপনি বলছেন কেন?"

"প্রথমদিন আপনি বলতেই হয়—পরিচয় হয়ে গেলেই ছোট করে নেয়া যাবে।" সুপ্রিয়া হাসিতে সুন্দর দেখাচ্ছে।

"পরিচিত হতে পারলে ত আমার সৌভাগ্য!" উঠে দাঁড়াল রেবা।

"বারে—" সুপ্রিয়া উচুঁতে নিয়ে গেল সুর: "ওরকম চট করে চলে গেলে পরিচয় হয় কখনো? বসুন।"

"না আজ চলি সুপ্রিয়াদি—" অনুনয়ে নরম শোনাল রেবার গলা: "আমি যাই নিরঞ্জনদা—খবর দেব।"

"আচ্ছা—" রেবাকে ধরে রাখবার কোনো ভান এলো না নিরঞ্জনের গলায়: "সুবিধেমতো খবর দিয়ে যেও।"

"চলি, কেমন?" যে নমস্কারটা পরিচয়ের বেলায় দেওয়া হয় নি তা দিয়ে রেবা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ওরা দু'জনে নিঃশব্দে সিঁড়িতে স্যাণ্ডেলের আওয়াজ শুনল। আওয়াজ মিলিয়ে গেল। সুপ্রিয়া একটু জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বললে: "মেয়েটি বেশ।"

"কেন? তোমায় সুপ্রিয়াদি বলেছে বলে?" চুপচাপ হাসতে লাগল নিরঞ্জন।

"নিশ্চয়। তার মানে মেয়েটি অসামাজিক নয়।"

"অসামাজিক হলে ওর চলে না।"

"কারোরই চলে না—অবশ্যি আপনার চলে।"

"আমার চলে?" নিরঞ্জন মুখ থেকে হাসি তুলে নিলে: "দুয়ারে-দুয়ারে গিয়ে যাকে উপার্জন করতে হয়—অসামাজিক হবে সে কোন্ সাহসে?"

"থাক্—ঝগড়া করতে আমি আসি নি। আপনার লেখাটা কদ্দূর হল!"

"হচ্ছে না—এগোচ্ছে না।"

"কেন?"

"লেখাও ভুলে যাচ্ছি—পঙ্গুতা।"

"তা-ই কি? না, অর্থনীতি আপনার ভালো লাগছে না!"

"এতে অর্থনীতির বিশ্লেষণ ছাড়া আর কী-ই বা আছে—তা নয়, যা বলেছি তা-ই, পঙ্গুতা।"

"ওতে রাজনীতির চিন্তা জুড়ে দিন—দেখবেন পঙ্গুতা সেরে গেছে।"

"তোমায় ত বলেছি, রাজনীতির চিন্তা আমি করিনে—ছেড়ে দিয়েছি!"

দেয়ালের ব্র্যাকেটে ঝোলান জামা-কাপড়ের উপর চোখ নিয়ে সুপ্রিয়া হেসে উঠল: "খদ্দরের উপর যার এতো মায়া কে বলবে সে রাজনীতি করে না?"

"ওটা অভ্যাসবশে পরা।" নিরঞ্জনের ঠোঁটের দু'টি প্রান্ত নম্র, বিষণ্ন দেখাচ্ছে: "রাজনীতি আমি ছেড়ে দিয়েছি এই রেবার দাদার মৃত্যুর পর।"

"সে কী?" একটু জড়িয়ে এলো সুপ্রিয়ার গলা: "আপনার বন্ধু বেঁচে নেই!"

"না।" নিরঞ্জন উঠে স্টোভের দিকে যেতে যেতে বললে:

"একটু চা খাবে? আমারও খাওয়া হয় নি!"

"খাব। কিন্তু আপনি কেন, আমিই করছি চা—"

"তুমি অতিথি—চুপ করে বোসো।" স্টোভ ধরাতে ব্যস্ত হল নিরঞ্জন।

"রেবা-ও ত অতিথি ছিল—তাকে চা খাইয়েছেন ত?"

"রেবা চা খায় না।"

"খায় না?"

"না। ওর জামা-কাপড়ের অবস্থা দেখে কি ভাবা যায় ও মর্জি-মতো চা খেতে পারে!"

সুপ্রিয়া চুপ হয়ে গেল। স্পিরিটের আগুনটার দিকে তাকিয়ে নিরঞ্জন বললে: "দশবছর হল ওরা কলকাতায় এসেছে। ওর দাদা কেশব, ও আর ওর মা পঞ্চাশ লক্ষ দেশত্যাগীরই তিন জন। বাবা তাঁর জন্মভূমিতেই মরতে পেরেছিলেন।" কুঁজো থেকে কেৎলীতে জল নিল নিরঞ্জন: "কেশব ম্যাট্রিক অবধি পড়েছিল—তারপর ঘোরতর স্বদেশী হয়ে উঠল। জেল, বন্দীশিবির কোনোটাই বাকি থাকে নি। রেবা দাদাকে ভালোবাসলেও রাজনীতিতে ঘেঁষে নি—ভাগ্যি ভালো, বি-এ পর্যন্ত পড়তে পেরেছিল।" পাম্পে মনোযোগী হল নিরঞ্জন।

সুপ্রিয়ার ভুরুদুটো কুঁচকে এসেছে। ভালো লাগছিল না তার শুনতে। কিন্তু যদি বলে তবে যেন রেবার প্রতি অন্যায় করা হবে। রেবাকেই ভাবছিল সুপ্রিয়া। একুশ বছরের একটি মেয়ে—বারো বছর বয়েসে এসেছে কলকাতায়, অনিশ্চিত ভাগ্য নিয়ে, বি-এ পর্যন্ত পড়েছে ধৈর্য ধরে—হয়ত কতো অভাব, কতো অসুবিধে ভুগতে হয়েছে দিনের পর দিন—কিন্তু নিজেকে তৈরী

করেছে পরিবারটাকে বাঁচাবার জন্যে!

স্টোভে কেৎলী চড়িয়ে দিয়ে নিরঞ্জন সুপ্রিয়ার দিকে তাকাল। শুকনো মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে একটু সময় লাগল সুপ্রিয়ার। চেয়ার থেকে উঠে সে বললে: "আপনি সরুন—চা-টা আমি করছি। আধেক কাজ ত করলেন, বাকি পালা আমার হোক।" স্টোভের কাছে গিয়ে বসল সুপ্রিয়া।

পাউডার-মিল্ক গুলছিল নিরঞ্জন। প্যানটা ছেড়ে উঠে পড়ল: "চা-টা ভালো হয় না আমার হাতে।" চেয়ারে এসে বসল সে। বললে আবার: "কাহিনীটা শেষ করি, শোনো।"

"শুনবার বাকি আছে আরো?" সুপ্রিয়া মুখ নীচু করে দুধের প্যানে হাত বাড়াল।

"একটু বাকি আছে। টাকাপয়সা যা এনেছিল কেশব, ঘর-ভাড়া, খাওয়া-দাওয়া, বোনের পড়াশুনোতে খরচ হয়ে গেল দু'বছরেই। তারপর তিনবছর বোনকে কলেজে পড়ানো যে কী অসম্ভব ব্যাপার গেছে তা ভাবা যায় না। কেরানীর একটা চাকরি। বন্ধুবান্ধবের সাহায্যই সম্বল। যাদবপুর কলোনীতে বন্ধুবান্ধবের সাহায্যেই একটা ঘর উঠল। মাথা গুঁজবার ঠাঁই হল, বোনের পড়া-ও শেষ হল।" নিরঞ্জন উঠে গিয়ে সুপ্রিয়ার মুখোমুখি দাঁড়াল: "পেয়ালাগুলো দাও, ধুয়ে আনছি।"

পেয়ালা নিয়ে ক্ষুদ্রকায় বাথরুমে এলো নিরঞ্জন। কেমন-যেন একটা অপমান বোধ করছিল সুপ্রিয়া। যেন রেবার হয়েই ভুগছিল সে দারিদ্র্যের অপমান।

বাথরুম থেকেই বলতে বলতে এলো নিরঞ্জন: "বোনের চাকরি হল কিন্তু সওদাগরি অপিস গুটানোর ফলে বেকার হল

কেশব। আমার কাছে প্রায়ই আসত সে—আমিও যেতাম ওদের কলোনীতে।”

পেয়ালাগ‍ুলো স‍ুপ্রিয়ার হাতে সমর্পণ করে নিরঞ্জন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলতে লাগল: “বোনের জীবনটা সে নষ্ট করল—এ-কথাই ঘ‍ুরেফিরে বলত কেশব।”

কেৎলীতে চা দিচ্ছিল স‍ুপ্রিয়া—আলাদা পট নেই—নিরঞ্জন রাতি[illegible] বিছানায়। মেঝেতে স্যাণ্ডেল ঘসতে ঘসতে নিরঞ্জন সাদামাটা গলায় বললে: “তারপর একদিন আত্মহত্যা করলে কেশব।”

ঘাড় উঁচু করে তাকাল স‍ুপ্রিয়া: “আত্মহত্যা ?” গলা ব‍ুজে গেল যেন তার।

“তার মনে হয়েছিল তার গ্রাসাচ্ছদনই বোনের জীবন সফল হবার পথে বাধা।” নিরঞ্জন দেখতে পেল স্টোভে দ‍ুধের প্যান নেই। কাজটা তাকেই করতে হল।

কেৎলীর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে স‍ুপ্রিয়া। নিরঞ্জন পেয়ালা সাজিয়ে চিনি ফেলল দ‍ু'চামচে করে। স‍ুপ্রিয়া উঠে দাঁড়াল: “আপনিই চা কর‍ুন।” চেয়ারে এসে চুপচাপ হয়ে রইল সে।

স্টোভ নিভিয়ে চা করতে লাগল নিরঞ্জন। স‍ুপ্রিয়ার ম‍ুখে শব্দ নেই। শব্দ করতে তারও আর ইচ্ছা করছিল না। চা তৈরী হল। টেবিলে এলো কাপগ‍ুলো। ওরা পাশাপাশি হয়ে চুম‍ুক-ও দিল চায়ে কিন্তু কথা হল না।

চায়ে শেষ চুম‍ুক দিয়ে স‍ুপ্রিয়া বললে: “রেবাকে আবার দেখতে ইচ্ছে করছে!”

"কেন?" সুপ্রিয়াকে ধরতে পারছে না নিরঞ্জন।

"দেখতাম এতো সহ্য করবার শক্তি ও কোথায় পেলে!"

"শক্তি থাক্ বা না থাক্ সহ্য না করে উপায় কী বলো!"

সুপ্রিয়া যেন আপন মনেই বলতে লাগল: "কতো সহ্য করতে পারে মানুষ—ক্ষুধা, অপমান, শোক—"

"তুমি একটা নূতন স্বাধীন দেশের নাগরিক হতে চাও—" নিরঞ্জন সুপ্রিয়ার কথার মুখটা কেটে দিলে: "আর তোমারই কিনা ক্ষুধা, অপমান আর শোক বড়ো হয়ে বাজছে—" মুখে হাসির আমেজ ফুটে উঠছে তার: "তাছাড়া রেবার মতো যারা গরীব—"

"বড়লোক কেউ নয়—যারা নিজেদের বড়লোক ভাবে তারা দুশ্চরিত্র!"

"চটে গিয়ে অনেক অদ্ভুত কথাই বলা যায় কিন্তু তাতে এ-সত্য মিথ্যে হয়ে যায় না যে গরীব আর ধনী বাংলাদেশে আছে আর এ-কথাও মেনে নিতে হয় যে গরীবরা অনেক কিছুই সহ্য করতে বাধ্য।" নিরঞ্জন মাস্টারি-ভঙ্গীতে কথাগুলো ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল।

"আমি বড়লোক নই—কিন্তু আমি সহ্য করতেও রাজি নই!"

নিরঞ্জন জোরে জোরে হেসে উঠল: "রেবা বড়োলোক নয় কিন্তু সহ্য করতে রাজি।"

সুপ্রিয়া গম্ভীর।

"যুক্তি হারিও না, সুপ্রিয়া—" নিরঞ্জন বললে।

যুক্তি হারিয়েই কথা বলেছে সুপ্রিয়া তাই গাম্ভীর্য ভেঙে

বেরিয়ে আসতে চাইল না।

নিরঞ্জনের মুখে হাসি অস্পষ্ট দেখাচ্ছে: "তোমাকে রেবার কাহিনী না শোনানোই ভালো ছিল!"

"কেন?" সুপ্রিয়া অন্যমনস্ক।

"শুনে মন খারাপ হয়ে গেছে।"

"মন আমার খারাপ হয় না, মেজাজ খারাপ হয়।"

"একটা রেবার কাহিনী শুনেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়? এমন কতোশতো রেবা ত আছে—রেবা কেন—রেবার চাইতেও দুরবস্থায় আছে কতোশতো—"

"কতোশতোকে ত আমি দেখি নি—দেখেছি রেবাকে।"

নিরঞ্জন নিরুপায় হয়ে অন্য কথায় যেতে চাইল: "কুন্তলার বিয়ে—শুনেছ ত সুপ্রিয়া?"

"শুনেছি।" সুপ্রিয়া কাপ দুটো তুলে নিয়ে ধুতে চলে গেল।

বাধা দিতে চেষ্টা করল না নিরঞ্জন। আলাপ চালিয়ে যাচ্ছে: "ছেলেটি স্টীল এঞ্জিনিয়র—রুবকেলায় চাকরি পেয়েছে কি পাবে।"

বাথরুম থেকেই আওয়াজ এলো জলের আওয়াজে মিশে: "জানি।"

"কুন্তলার কী সৌভাগ্য দ্যাখো!"

"কেন?"

"চোখের উপর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ হবে!"

"তাতে কুন্তলার উৎসাহ আছে না কি!"

"থাকা ত উচিত।"

"আমার বন্ধু বলে ?"

"খানিকটা—আর খানিকটা স্বাধীন ভারতের মেয়ে বলেও।"

"ভারতের ছেলেমেয়ে ত সবাই—" সুপ্রিয়া কাপ হাতে ফিরে এসে স্টোভের ধারে চলে গেল: "আপনি-ও—আপনার ত উৎসাহ নেই।"

"পরাধীন ভারতে আমার মন তৈরী—আমি কি ওসব বুঝি ?"

সুপ্রিয়া চেয়ারে এলো: "বুঝতে না চাইলে আর কে বোঝাবে ?"

"ওখানে একটা জাঁদরেল চাকরি পেলে হয়ত বুঝতে পারতাম !" নিরঞ্জন হাসতে লাগল।

"ইংরেজির মাস্টারের আর জাঁদরেল চাকরি পেতে হয় না।" সুপ্রিয়ার ঠোঁটে হাসির ফোঁটা যেন আশ্বস্ত করে তুলল নিরঞ্জনকে।

* * পাঁচ *

ছুটির দিন। নিমন্ত্রণ-চিঠি নিয়ে আসবে কুন্তলা। সুপ্রিয়া কুন্তলার জন্যে কয়েকটা ভেজিটেবল চপ তৈরী করছিল। ডাক-হাঁকের অন্ত ছিল না। বৌদি বলছিলেন: "তুমি পুড়িয়ে ফেলবে —দাও আমি ভেজে দিই।"

"বউ হয়েছ বলে কি রান্নাটা তোমার একচেটে?" মুখিয়ে উঠেছে সুপ্রিয়া। বৌদি পালিয়েছেন।

ভাজা শেষ করে ঠাকুরকে বুঝিয়ে দিল সুপ্রিয়া, চায়ের সঙ্গে যখন চপ পাঠাবে চপ যেন গরম থাকে আর চপ গরম করতে গিয়ে যেন পুড়িয়ে না ফেলে। ঠাকুর তটস্থ হয়ে তথাস্তু বললে।

আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে রান্নাঘর থেকে যখন বেরোল সুপ্রিয়া, বৌদি এসে সঙ্গে জুটলেন: "ঈস্, লাল হয়ে গেছ কী রকম?"

"আগুনের আঁচে লাল না হয়ে কী হয় মানুষ?" সুপ্রিয়া সিঁড়ি ধরল।

বৌদি পেছনে পেছনে: "কুন্তলাকে খাওয়াতে এতো পরিশ্রম করলে!" হাসির শব্দে শেষ করলেন কথা।

"যদি খেতে চাও তোমাকে খাওয়াতেও পরিশ্রম করতে পারি।"

"তাতে তোমার কী লাভটা হবে? আমি ত তোমার পরি-শ্রমের তারিফ করব না।" হাসি ফুরোয় না বৌদির।

"তারিফ শুনতেই বুঝি তুমি পরিশ্রম কর?"

"তাছাড়া কী? মা একদিন ভালো না বললে আমার মন খারাপ হয়ে যায়।"

"বউ হতেই জন্মেছিলে তুমি।"

ওরা ঘরে এলো। সুপ্রিয়ার ঘরে। ঘরটা ঝকঝক করছে। টেবিলক্লথ, বেড-কভার পাল্টানো হয়েছে—মেঝেটা তকতকে—আলনায় শাড়িগুলো সব ইস্ত্রি করা—তাকে বইগুলো গুছনো। বৌদি চারদিকে তাকিয়ে বললে: "কুন্তলার জন্যে এতো সব?"

"এতো কী দেখলে তুমি! আমার ঘর কি তোমার ঘরের মতো অগোছাল থাকে?" সুপ্রিয়া স্নানের জন্যে তৈরী হতে লাগল।

"আমি আর গোছালো হয়ে করব কী—আমার ত বিয়ে হতে বাকি নেই।"

"বিয়ে হয়েছে কিন্তু মার খাওনি—এবার খাবে।" হাত তুলে মারের ভঙ্গীটা-ও দেখালে সুপ্রিয়া।

"ও রকম মাস্টারি ভঙ্গীতে তোমাকে মোটেও মানাচ্ছে না।" বৌদি যেতে যেতে বলে গেলেন।

স্নানে এলো সুপ্রিয়া। কী তাকে মানায়? ভাবছিল সে। সারা গায়ে জলের ফোয়ারা পড়ছে। দেহের বিনিময়ে মেয়ে-দের বাঁচতে হয়! কী লজ্জা! সাবানের ফেনা গায়ে বুলিয়ে নিলে সুপ্রিয়া দারুণ ক্ষিপ্রতায়। জলের ধারায় নির্মল, শুচি করতে লাগল যেন নিজেকে তারপর। সে পালাবে। প্রকৃতির ষড়যন্ত্র থেকে পালিয়ে বাঁচা-ও একটা বড় কাজ—পালিয়ে মরার-ও গৌরব ঢের।

গা মুছতে মুছতে আবারও সুপ্রিয়া ভাবলে, কী ভঙ্গীতে

তাকে মানায়? বৌদি হয়ত চান চলায়-ফেরায় কথায়-কথায় ঢেউ-এর দোলা থাক তার শরীরে। মা হয়ত চান একটি স্বামী-পুরুষের পাশে তার খুশি-খুশি চেহারা। ক্যামেরার মুখে মেয়েরা যেমন খুশি-মুখ হয়ে ওঠে তেমনি। দাদা কিছু চান বলে মনে হয় না। নিরঞ্জন চায় বোধ হয় সে যা তা-ই। আমি যা হয়েছি তা-ই আমাকে মানায়—মনে-মনে বললে সুপ্রিয়া—পরের চাওয়ার কী দাম আছে!

মিলের একটা আটপৌরে শাড়িতে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বাথরুমের রুদ্ধ হাওয়া থেকে বেরিয়ে এলো সুপ্রিয়া।

ঘরে মার সঙ্গে কুন্তলা অপেক্ষা করছে। মার হাতে রঙীন চিঠি। নিমন্ত্রণ হয়ে গেছে। সুপ্রিয়ার নিমন্ত্রণ অপেক্ষা করছে কুন্তলার হাতে ধরা আইভরি-কার্ডে। 'ভাই, আমার বিয়ে...' কার্ডের ভাষাটা-ও যেন সুপ্রিয়া পড়তে পারল। হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

"বাঃ এসে গেছ?" স্নাত মুখের স্নিগ্ধ হাসি অভ্যর্থনা জানাচ্ছে কুন্তলাকে।

"কখন!" কুন্তলা হাতের কার্ড দিয়ে তাল ঠুকে বললে।

"হতেই পারে না। স্নান করতে আমার পাঁচমিনিট-ও লাগে নি।"

মা যেতে যেতে বললেন: "তোমরা বোসো—আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

সুপ্রিয়া আয়নায় দাঁড়িয়ে মাথায় চিরুণী চালাতে লাগল। কুন্তলা টেবিলের উপর কার্ডটা ছেড়ে দিয়ে বললে: "নাও তোমার চিঠি।"

"মা চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছেন ত?" সুপ্রিয়া চিঠিটা এক পলক দেখে নিয়েছে।

"খুব খুশি। বললেন, এই ত লক্ষ্মীমেয়ের মতো কাজ।" মিষ্টি-মিষ্টি হাসল কুন্তলা।

"লক্ষ্মীমেয়ে হয়ে তুমিও ত বেশ খুশি!"

"আহা! আমাতে খুশিটা দেখলে কোথায়?"

"তোমার চোখে-মুখে বিয়ের শ্রীতে!" একপিঠ চুল ছড়িয়ে কুন্তলার মুখোমুখি বসল সুপ্রিয়া।

"বরং তোমাতে কনে-শ্রী দেখছি আমি আজ!" কুন্তলার ঠোঁটে মরা হাসি ফিরে এলো।

"তাই না কি। তাহলে আমার লক্ষ্মী হবার সুযোগ চলে যায় নি!" সুপ্রিয়া হাসির মিহি গিটকিরিতে ঘর ভরিয়ে তুললে: "বৌদি ত আমার শুধু মাস্টারি ভঙ্গীই দেখতে পান।"

কুন্তলা জিব কাটল: "ঈস্! বৌদির জন্যে ত চিঠি আনা হয় নি!"

"তাতে কি—আমার চিঠিটা বৌদিকে দিয়ে দাও, আমি ত আর তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করছিনে!"

ট্রে হাতে মাসু সন্তর্পণে এসে ঘরে ঢুকল, তার পেছনে বৌদি।

সুপ্রিয়া টেবিল থেকে চিঠিটা নিয়ে বললেঃ "এই নাও বৌদি তোমার চিঠি।"

বৌদি ট্রে থেকে চা আর খাবার টেবিলে তুলে দিতে দিতে বললেন: "তোমার হাত থেকে আমি চিঠি নেব কেন?"

"বিয়ের কনে কুন্তলা লজ্জা পাচ্ছে নিজের হাতে চিঠি

বিলোতে!"

"তাই নাকি?" কুন্তলার মুখে তাকিয়ে বৌদি হাসলেন।

"বুড়ো বয়েসে বিয়ে করলে লজ্জা একটু থাকেই ত!" কুন্তলা নিরুপায় হয়ে বললে।

খাবার সাজানো হল। রাসু লজ্জায়-সঙ্কোচে যেন পালিয়ে বাঁচল। বৌদি সুপ্রিয়ার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে বিছানায় বসে পড়তে শুরু করলেন।

"তোমার চা-চপ জুড়িয়ে যাচ্ছে, কুন্তলা—মনটা এদিকে দাও একটু!" কুন্তলার মনোযোগ বৌদি থেকে সরিয়ে আনতে চাচ্ছে সুপ্রিয়া।

"ব্বাবা এতগুলো চপ!" কুন্তলা চায়ের কাপে হাত দিলে।

"খেতে শেখো, গিন্নীরা বেশি খায়।" সুপ্রিয়া বললে। এক সঙ্গেই বৌদি বললেন: "আপনার বিয়ের ফুরতিতে দিদি-ভাই নিজের হাতে চপ করেছেন!"

"তাই না কি! তাহলে ত পেট ভরে খেতেই হয়!" কুন্তলা চপের একটুকরো মুখে পুরে চিবোতে শুরু করলে।

"বলো চমৎকার কি না!" সুপ্রিয়া চায়ে চুমুক দিচ্ছে।

"খেয়ে দ্যাখো—কিন্তু একটার বেশি পাচ্ছ না—বৌদি, নিন একটা—বাকি চারটে আমার।" কুন্তলা ভাগাভাগি শুরু করলে।

চপে একটা ছোট কামড় বসিয়েই বৌদি বললেন: "পাকা বাবুর্চির হাত।"

"তা-ই বলো!" সুখ্যাতি আদায়ে উঠে পড়ে লেগেছে যেন সুপ্রিয়া।

"বাঙালীর ঘরে অচল।" চপের সঙ্গে চিবিয়ে বললেন

বৌদি।

"বাঙালীর ঘরে সচল হতে চাচ্ছে কে?" সুপ্রিয়া এতোক্ষণে একটা মর্জিমাফিক কথা বলতে পেরে খুব সাচ্ছন্দ্য বোধ করল।

আরাম করে খেয়ে চলেছে কুন্তলা নিঃশব্দে। কিন্তু শব্দ করতে হল: "বিলেতে ওরা কিন্তু নিজেরাই রুটীর অভাবে আছে!"

বৌদি হাসলেন: "দিদিভাই না খেয়েও থাকতে জানে।"

"তোমরা যদি প্রাণ ভরে খেতে শুরু করো, কারো কারো না খেয়ে থাকা শিখতেই হবে।"

কুন্তলা একটা চপ বৌদির হাতে গুঁজে দিয়ে বললে: "নিন বৌদি আরেকটা—তিনটেতেই আমার প্রাণ ভরে খাওয়া হয়ে গেছে।"

"দিদিভাই নাও আদ্ধেকটা!" বৌদি সুপ্রিয়াকে সাধলেন।

"আমার খাওয়া হয়ে গেছে।" চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে সুপ্রিয়া চুপচাপ হয়ে গেল।

বৌদি কুন্তলার সঙ্গে সৌজন্যের আলাপ জুড়ে দিলেন: "বিয়ের পর আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?"

"হানিমুনে কোথা-ও না—" পেয়ালায় ঠোঁট নিয়ে হাসি লুকলো কুন্তলা: "লোহালক্কড় আর আদিবাসী বোঝাই কোনো জায়গায়।"

"ভালো লাগবে কলকাতা ছেড়ে থাকতে?"

"একটা জীবন ছেড়ে আরেকটা জীবন যদি ভালো লাগে তবে আর জায়গা বদলে কী খারাপ লাগবে?"

"জীবন বদলটা ভালোই লাগবে।"

সুপ্রিয়া কথা বললে: "তুমি গ্যারান্টি দিচ্ছ বুঝি?"

"গ্যারান্টিই হোক আর যা-ই হোক, সে ত আর তুমি দিতে পারো না!" কুন্তলা কোণঠাসা করে দিলে সুপ্রিয়াকে।

"বৌদি-ও দিতে পারে না, কারণ বৌদি ভালো নেই।"

"কেন?" রক্তের চাপ বেড়ে গেল বৌদির মুখে।

"কারণ সুপ্রিয়ার মতো ননদ জুটেছে!" কুন্তলা হেসে উঠল।

হাসিতে যোগ দিলেন বৌদি। হাসল সুপ্রিয়াও। হাসতে পেরে সুপ্রিয়ার ভালোই লাগল আর বুঝতে পারল বৌদির সঙ্গে তার রূঢ় ব্যবহারটা কুন্তলার নজর এড়ায় নি। বিয়ে করা যে বৌদির পক্ষে একটা মস্ত অপরাধ হয় নি কুন্তলার বিয়ের ইচ্ছেতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল সুপ্রিয়ার মনে। হাসি থামিয়ে বললে সুপ্রিয়া: "সত্যি বলো ত বৌদি, আমার কথায় তুমি রাগ করো?"

"সত্যি বললে যে তুমি রাগ করবে।" কুন্তলা খাওয়া-শেষে ছোট একটা ঢেঁকুর তুললে।

"দিদিভাই আপনাকে পেট ভর্তি খাওয়ালে আর আপনিই ওর বিপক্ষে যাচ্ছেন?" বৌদি উঠে দাঁড়ালেন।

"ও কী? কোথায় যাচ্ছেন? বসুন।" আড্ডাটা জমাট রাখতে চেষ্টা করল কুন্তলা।

"না ভাই—আপনারা কথা বলুন—মা হয়ত আমার দেরি দেখে নিজেই রান্না চড়িয়েছেন।" ব্যস্ত হয়ে চলে গেলেন বৌদি।

কুন্তলার সঙ্গে একা হতে পেরে সুপ্রিয়া বললে: "বৌদিকে নিয়ে মা খুব সুখে আছেন।"
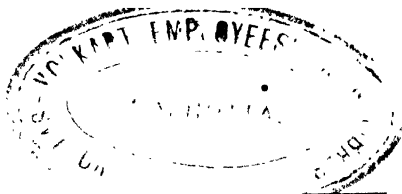
অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠল কুন্তলার মুখে: "সুখে? উঁহু।"

সুপ্রিয়া বোকা বনে গেল: "দুঃখটা কিসের?"

"নাতি-নাতনির।"

"ও" সুপ্রিয়া মুখ বন্ধ করলে।

দরকার ছিল না তবু কুন্তলা আরো স্পষ্ট হতে চাইল: "বিয়ে হয়েছে কিন্তু বাচ্চা হবে না, ও কি ওঁদের সয়?"

"না, প্ল্যানড্ ফ্যামিলিরও ধারে-কাছে যাবেন না শ্বশুর-শাশুড়ির দল—তুমি জেনে রেখো!" সুপ্রিয়া হাসতে লাগল।

"আমার শ্বশুর-শাশুড়ি স্বর্গে।"

"হলই বা—এঞ্জিনিয়র সাহেব ত বলতে পারেন যে ম্যালথাস নরঘাতক!"

"তাঁর বলাবলিতে কী হবে? আমি তোমাদের প্ল্যানড্ ফ্যামিলির ভক্ত।"

"খুশি হলাম, একেবারে যে জাহান্নামে যাও নি!"

কুন্তলা উপযুক্ত জবাব খুঁজল: "না, বিয়ের জাহান্নামেও না, ক্যারিয়ারের জাহান্নামেও না।"

"ক্যারিয়ারের জাহান্নামে যেতে হলে ত অভিনেত্রী হতে হয় —সে আর কে যাচ্ছে—" যেন আপন মনেই বললে সুপ্রিয়া।

কুন্তলা অস্বস্তি বোধ করল: "থাক্—অন্য কথা বলো। নিরঞ্জনদার সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার? তোমার খবর নিচ্ছিলেন সেদিন আমার কাছে।"

"দেখা হয়েছে!"

"অদ্ভুত!" হঠাৎ কুন্তলার মুখ ফর্সা হয়ে উঠল যেন:

"মাসীমা আমাকে নিরঞ্জনদার খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন।"

"কে, মা?"

"হ্যাঁ। নাম-ধাম-টাকাকড়ির খবর!" সশব্দে হেসে উঠল কুন্তলা।

"আমি বলেছিলাম ওঁর কথা—সত্যি যাচাই করলেন হয়ত।" একটু মুষড়ে পড়ল সুপ্রিয়া—মা আরো কী প্রশ্ন করেছেন কে বলবে?

"নিরঞ্জনদার জোর সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছি আমি।"

"আমি দিই নি।" নিস্পৃহ গলায় বললে সুপ্রিয়া।

"মাসীমা আলাপ করতে চাইলেন ওঁর সঙ্গে।"

"কেন?"

"ভালো লোক শুনলে আলাপ করতে চায় না মানুষ?"

কুন্তলার সঙ্গে ও আলাপটা নিয়ে আর এগোতে সাহস হচ্ছিল না সুপ্রিয়ার। হয়তো কুন্তলা-ও এমন কথা বলে বসবে যা শুনতে মোটেও রুচিকর হবে না। তাই সুপ্রিয়া অন্য কথায় যেতে চাইল: "তুমি রেবাকে চেনো, কুন্তলা?"

"রেবা? নিরঞ্জনদার এক বন্ধুর বোন যে রেবা?"

"যাদবপুর থাকে।"

"চিনি নে। শুনেছি ওর কথা।"

"আমার সঙ্গে আলাপ হল।"

"নিরঞ্জনদার ঘরে?" কুন্তলা থামল না: "বিয়ে-টিয়ে করেছে রেবা?"

"কী জানি! সিঁদুর-টিঁদুর ত লক্ষ্য করি নি।"

"তোমার জুড়ি ও-মেয়ে—বিয়ে করবে না।" একটু নড়ে-চড়ে গল্প বলার ভংগীতে বসল কুন্তলা: "রেবার দাদারই না কি ইচ্ছে ছিল না ও বিয়ে করুক। নিরঞ্জনদার হয়ত ইচ্ছে ছিল রেবাকে বিয়ে করবেন—প্রেম নয় শিভালরি। আঁচ পেয়ে রেবার দাদা যদিবা নরম হল—রেবা বললে সে বিয়ে করবে না—চাকরিই তার জীবন।"

"রেবার দাদা যে আত্মহত্যা করেছেন—জানো না?"

"জানি।"

"রেবাকে দেখলে মনে হয় না এতো দুঃখ ওর উপর দিয়ে গেছে—আশ্চর্য ওর দাঁড়িয়ে থাকবার শক্তি।"

"জেদী হলে দুঃখ পেতেই হয় আর দুঃখ পেতেও চায় তারা।"

"তার মানে আমিও দুঃখ পাব—স্বীকার করি আমি জেদী।"

"নিশ্চয় দুঃখ পাবে।"

মা এলেন। এসেই চেঁচিয়ে উঠলেন: "রাসু—চায়ের বাসন-গুলো পড়ে আছে—কোথায় তুই?" নীচে থেকে রাসুর আসবার খবর পাওয়া গেল। নিশ্চিন্ত হয়ে মা এসে সুপ্রিয়ার বিছানায় বসলেন: "আমি বললাম মিষ্টি-টিষ্টির কথা—না ওর জেদ, তোমাকে চপ খাওয়াবে।"

"মিষ্টি এতো ভালো হত না মাসীমা—চপ যা হয়েছে!" কুন্তলা মাসীমার খেদ মেটাতে ব্যস্ত হল: "আমি সুপ্রিয়াকে কী বলছিলাম জানেন, ও দুঃখ পাবে।"

"পাবেই ত।" মা সুপ্রিয়ার মুখে তাকালেন: "তুমি ভাবো বিলেত-আমেরিকা ঘুরলেই সুখী হবে—তা হয় কখনো?"

"ঘুরলেই সুখী হব এ-কথা আমি বলি নি মা—বলেছি ঘুরব।" আব্দারের ভঙ্গীতে বললে সুপ্রিয়া।

"ওকে সংসারী করে তুলুন, মাসীমা—" কুন্তলা নির্ভাবনায় বলতে পারল।

"আমি করব কি করে বলো—" মা উদাস হয়ে গেলেন: "তোমাকে দেখেও যদি ভাবত নিজের কথা!"

"নিজের কথা ছাড়া আর কারো কথা ভাবি নে, মা,—আমি এম্নি স্বার্থপর!"

"নিজের কথা তুমি ভাবছ না, কুন্তলা ভেবেছে।"

"ও যে কতো দুর্বল তা-ই ভেবেছে কুন্তলা।"

"তুমি একটা মস্ত জোয়ান, না?" পরাজিতের ক্ষোভে ধারাল শোনাল কুন্তলাকে।

"চলতে ফিরতে মেয়েদের যে কতো অসুবিধেয় পড়তে হয় তা-ই বুঝতে চাইবে না ও।" মা দারুণ নৈরাশ্যে একটা শ্বাস ফেললেন।

"মনে হচ্ছে তোমরা দু'জন যুক্তি করে আমার হৃদয়-পরিবর্তনের কাজে লেগেছ!" সুপ্রিয়া হাসতে লাগল।

"আমরা যুক্তি করি না-করি তোমার হৃদয়-পরিবর্তন হওয়া দরকার।" মাসীমাকে সামনে পেয়েই কুন্তলা কথাগুলোতে জোর দিতে পারছিল।

"বিয়ের জন্য আকুল হওয়া দরকার!" কুন্তলাকে যেন ভেংচিয়ে দিলে সুপ্রিয়া।

"আকুল হওয়া কি! বিয়ে একটা কাজ—সবার জন্যে এ-কাজ!" মা শান্ত গলায় বললেন।

"অন্য কাজ ওর কাছে বেশি জরুরী, মাসীমা—কিন্তু সে-কাজ ও জীবনে করতে পারবে কি না তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই!" একটু থমথমে কুন্তলা।

"পড়ানোর কাজ একটা কাজ?" মা ঠোঁট ভাঙলেন।

"সমস্ত দেশকে পড়ানোর কাজ ত একটা কাজ!" অবলীলায় বললে সুপ্রিয়া।

"চিন্তা নেই, সে-কাজ তোমার জুটছে না!"

পূর্ণ সমর্থনে কুন্তলার দিকে তাকিয়ে মা বললেন; "কী আর বলবে ওকে? ওর মাথাই খারাপ হয়ে গেছে!"

"যা বলেছ—" সোল্লাসে বললে সুপ্রিয়া: "মাথা ভাল থাকলে বিয়ে ছাড়া আর গতি থাকত আমার!"

"তুমি ভাবছ তুমি যা করছ তুমি যা বলছ তা-ই ভালো! ভালোমন্দ বুঝবার ক্ষমতা তোমার নেই!" মা বিরক্ত হলেন। মনে হল, অনেক দিনের পোষা রাগ-ও তিনি কথাগুলোতে মিশিয়ে দিচ্ছেন।

মাসীমার কথাটাকে চেপে দেবার জন্যে কুন্তলা ব্যস্ততা দেখালে: "না মাসীমা—ও দেখে শিখতে চায় না, ঠেকে শিখতে চায়!"

সুপ্রিয়া হাত নেড়ে বললে: "না বাপু—শিখতেই আমি চাই নে। ভালোমন্দ বাছাই করবার মন নেই আমার।"

"মন একটা আছে ত? তাহলেই হল।" কুন্তলা হেসে উঠল।

বোঝাপড়ার হাল ছেড়ে দিয়ে মা উঠে পড়লেন। যেতে যেতে বললেন: "শরীরটা ভালো থাকলে বিয়েতে আমি যাব, কুন্তলা।"

"খারাপ থাকলেও যেতে হবে, মাসীমা—" মাসীমার পেছনে কথাটা ছুঁড়ে দিল কুন্তলা। তারপর বললে: "আমিও চলি, সুপ্রিয়া!"

সুপ্রিয়া বাধা দিলে না। দাঁড়িয়ে বললে: "আমি কিন্তু যাব না।"

কুন্তলা সুপ্রিয়াকে ছোট একটা ধাক্কা দিয়ে বললে: "ঈস!"

*** * ছয় ***

নিরঞ্জন ভেবে চলেছিল তার হঠাৎ আবির্ভাবে সুপ্রিয়া অপদস্থ হয়ে যাবে না ত! কিন্তু যেতে যে তাকে হবেই।

সাংবাদিক নির্মল বেহুঁশ হয়ে কথা বলে চলেছে। দুর্ভিক্ষ, কমিউনিটি প্রোজেক্ট, বাইটন কাপ, অ্যাটমিক টেষ্ট একসূত্রে গাঁথা হয়ে যাচ্ছে। নিরঞ্জনের হুঁ-হাঁ-ই তার কথা বলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

বিকেলের দিকে বেরোতে হবে। এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে ট্রাম নেবে কি বাসেই যাবে—ভাবছিল নিরঞ্জন। ততোক্ষণে বেতিয়া-উদ্বাস্তু সমস্যায় এসে গেছে নির্মল।

নির্মলের কাছে চেয়েছিল টাকা। ত্রিশটাকা কেন, ত্রিশটা পয়সা দেবার তার উপায় নেই। সরাসরি তাকে জানিয়ে দিয়েছে। থাকলেও অবশ্য সরাসরিই ফেলে দিত টাকা। কুন্তলাদের বাড়িতে যাওয়া কেমন?

কিন্তু কুড়ি টাকা আগেই নেওয়া আছে—আর চাওয়া যায় না। নিরঞ্জন ঘাড় নাড়ল।

নির্মল এবার তাকে অনুরোধ করছে, সিপাহী বিদ্রোহের উপর একটা রচনা তৈরী করবার জন্যে। শতবার্ষিকীতে ব্যবহার করা যাবে। চারদিকে আলোচনা হচ্ছে—মালমসলার অভাব হবে না।

সুপ্রিয়ার কাছে এই প্রথম টাকা চাওয়া। একটু যেন সঙ্কোচ হচ্ছে। ভুরু কুঁচকে উঠল নিরঞ্জনের।

"তুমি রাজি নও ?" নির্মল কথা বলাতে চাইল নিরঞ্জনকে দিয়ে।

"রাজি—রাজি—সিপাহী-বিদ্রোহ ত ?" নিরঞ্জনকে বলতে হল।

"ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার দু'নৌকোতে পা দিও না—দেবে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা।" নির্মল একটা চারমিনার সিগারেটের কড়া ধুয়োতে শ্রান্তি-লাঘব করতে চাইল: "তা নইলে ঘটনাটা ঠিক প্রজেক্টেড্ হয় না।"

"মনস্তত্ত্ব ? আমি তার কী জানি ?" চা তৈরীতে উঠে গেল নিরঞ্জন।

"মন বলে একটি পদার্থ তোমার আছে ত?"

"আছে কি না সন্দেহ।"

"কেন, হারিয়ে বসে আছ না কি?" হো-হো শব্দে হেসে উঠল নির্মল।

"হারিয়েছি আলবৎ—স্বদেশী করতে গিয়ে!"

"তবু ভালো। আমি ত ভাবলাম কোনো মেয়ে-পড়াতে গিয়ে গল্পের নায়ক হয়ে উঠলে না কী ?" নিজের কথার আনন্দে নিজেই হাসতে লাগল নির্মল।

"খুব সোজা রাস্তায় আজকাল তোমার ভাবনা চলতে শুরু করেছে দেখছি!"

"মানুষ আজকাল খুব স্বচ্ছ হয়ে গেছে ত!"

"কিন্তু তুমি-আমি ত আর আজকালের মানুষ নই!"

নির্মল এবার আজকালকার ছেলে-মেয়েদের কথায় মেতে উঠল। সে পুরনো দিনের মানুষ ঠিক কিন্তু তার ছেলের বয়েস

ত পনেরো। ছেলেমেয়েরাই আজকাল বাপ-মাদের তৈরী করে। স্বাধীনতা কি আর কেউ পেয়েছে—পেয়েছে এখনকার ছেলে-মেয়েরা। পরাধীনতার দোষ ছিল গোপনতা, স্বাধীনতার দোষ খোলামেলা, বে-আব্রু হওয়া। নিরঞ্জনের কী—একা এক ঘরে বন্দী হয়ে আছে—পরিবর্তনের বাষ্পও লাগছে না গায়ে। ছা-পোষা মানুষ নির্মল বুঝতে পারছে কোনদিন কোনদিকে হাওয়া বয়। নিরুপায়। বদলে যেতে হচ্ছে তাকে। বদলে না গেলেই দুঃখ।

নিরঞ্জন মজা পেয়ে বললে: "ভালোই ত। মনের স্বাস্থ্য ভালো হচ্ছে তোমার।"

সিগারেটের টুকরো স্যান্ডেলের নীচে মাড়িয়ে নির্মল পরি-তাপ শোনাতে ব্যস্ত হল: "না করলে চাকরি, না করলে ঘর—মনের স্বাস্থ্যের খবর তুমি কী জানবে! তোমার এখানে এসেই যা-একটু কথা বলা। ঘরেই বলো আর চাকরিতেই বলো সাত-চড়েও টুঁ শব্দ করতে নেই। করি নে। করলেই বিপদ।"

"কথা বলার বিপদ ত আছেই। সব দিকেই আছে।" সুপ্রিয়াকে ভাবলে নিরঞ্জন: আমি কি সুপ্রিয়ার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারি?

নির্মল আরেকটা সিগারেট ঠুকতে শুরু করল: "বিয়ে যে করো নি ভালোই করেছ, নিরঞ্জন!"

এক কাপ চা নির্মলের হাতে তুলে দিল নিরঞ্জন: "সব বিবাহিতই এ-কথা বলে।"

"আমাদের প্রণয়ের বিয়ে হে! কিন্তু বিয়েটাই সত্য হয়ে রইল—প্রণয় গেল মিথ্যে হয়ে!"

"বিয়েটাকে মিথ্যে করবার ইচ্ছে হয় না কি?"

"ইচ্ছের এতো জোর কী আর এ-বয়েসে থাকে?"

থাকে না। নিরঞ্জনের চাইতে আর কে বেশি জানে এ-কথা? দাবী জানাতেও একটা বয়েস লাগে। চাওয়ার বয়েস যেন আর তার নেই। যেটুকু পেয়েছে, যেটুকু পাবে তা-ই নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে। পঙ্গুর মতন। অন্যায়কেও সে সহ্য করতে পারছে পঙ্গুর মতন। জীবনে পাওয়ার বেশি-কিছু নেই, সহ্য করবার অনেক কিছু আছে। অন্যমনে চায়ে চুমুক দিতে লাগল নিরঞ্জন।

"আসলে আমরা মিস্‌-ফিট্‌।" চা-সিগারেটের মৌজে হাল্কা হয়েও গম্ভীর কথা পাড়লে নির্মল: "না হল ছেলেবেলাকার জগতের সঙ্গে বনিবনাও—না হচ্ছে এখনকার জীবনের সঙ্গে মনের মিল!"

"মধ্যবিত্তের জন্যে ত পৃথিবী নয়।"

"বলো, মধ্যবয়সীর জন্যে পৃথিবী নয়।" নির্মল হাসতে লাগল।

"আমরা যখন যে বয়েসে থাকি সে বয়েসটাই অকর্মণ্য মনে হয়। দোষটা বয়েসের নয়—সুযোগের অভাবের।" চা খাওয়া শেষ হল নিরঞ্জনের, বললে: "ক'টা বাজে?"

নির্মল হাত-ঘড়ি দেখে সময় জানালে—নিরঞ্জন টেবিলের উপর নিজের হাতঘড়ি দেখে বললে: "আমারটাই বোধ হয় পাঁচ-মিনিট স্লো যাচ্ছে—ঘড়ি সারাবার পয়সাটা পর্যন্ত বাড়তি হয় না, বুঝলে নির্মল?"

"এই ত সবে প্ল্যানিং শুরু!" অর্থনীতির তত্ত্বকথা শোনালে নির্মল।

নিরঞ্জন বেরোবার জন্যে তৈরী হতে লাগল।

নির্মলের সঙ্গ নিরঞ্জনকে যতোটাই হাল্কা করুক রাসবিহারী এভিনিউর বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে পা দুটো যেন তার একটু ভারি হয়ে উঠল। আর আশ্চর্য, একটু ভয়ও যেন আক্রমণ করল তাকে। ভয়ের অনুভূতিটা সম্পূর্ণ নূতন। সুপ্রিয়াকে ত ভয় করে না সে কিন্তু সুপ্রিয়ার বাড়িতে সুপ্রিয়াকেই ভয়ানক মনে হচ্ছে তার। যেমন কলেজের অধ্যাপিকা সুপ্রিয়া আলাদা তেম্নি বাড়ির সুপ্রিয়াও হয়ত আলাদা। অন্তত তার ঘরের সুপ্রিয়াকে সে পাচ্ছে না এখানে। তাছাড়া তার আসা-টা অপ্রত্যাশিত। সুপ্রিয়া যদি তার আসা পছন্দ করত তাহলে অনেক আগেই তাকে আসতে বলত বাড়িতে। আলাপে বাড়ির কথা অনেকই বলেছে কিন্তু বাড়িতে এসে তার সঙ্গে আলাপ করতে কোনোদিন বলে নি। তবু নিরঞ্জন এলো—তাকে আসতে হল রেবার জন্যে।

গেট পার হয়ে বাড়ির বারান্দায় পা দিল নিরঞ্জন। রাসু ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল। থমকে দাঁড়াল তার সামনে।

রুমালে কপালের ঘাম মুছে নিরঞ্জন জিজ্ঞেস করলে: "সুপ্রিয়া দেবী আছেন?"

"আছেন। ডেকে দিচ্ছি। আপনি এ-ঘরে বসুন।" ঘর দেখিয়ে দিয়ে রাসু সুপ্রিয়াকে খবর দিতে চলে গেল।

রাসুর ভদ্রতায় খানিকটা স্বস্তি যেন ফিরে পেলো নিরঞ্জন। বসবার ঘরে এসে একটি চেয়ারে চুপচাপ অপরাধীর মতো বসে পড়ল। ঘরে সেটি-ও ছিল কিন্তু তাতে সে বসতে পারল না। এমন কি ফ্যানটা খুলে দেবারও সাহস হল না।

সে আবার ভাবতে লাগল। আসতে হল তাকে রেবার
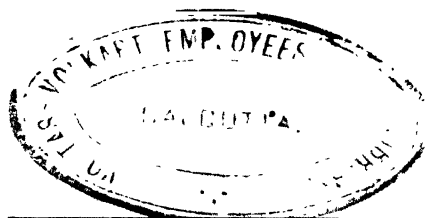
জন্যে। এ আসা-টা কী ভাবে নেবে সুপ্রিয়া তা-ও ভাবতে হচ্ছে। সুপ্রিয়া কি ভাববে রেবার জন্যে তার দুর্বলতা আছে? ভাবা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবনা ভাবে না সুপ্রিয়া—এই যা সুবিধে। তাছাড়া রেবার উপর সুপ্রিয়ারও একটা টান আছে, লক্ষ্য করেছিল নিরঞ্জন। টাকা চাইলে কি সুপ্রিয়া মনে করবে না এই টানেরই সুযোগ গ্রহণ করছে সে? সে কী সত্যি তা-ই করছে? না। টাকা তার চাই আর এখন সুপ্রিয়া ছাড়া আর কারো কাছে টাকা চাওয়া যায় না। আটকে পড়লে নির্মলই ছিল ব্যাঙ্কার কিন্তু বাজার-চড়তিতে সে নিজেই অভাবগ্রস্ত। আটকাতে হয় রেবাদের পরিবারের জন্যেই। কিন্তু কেন? এ যেন দেশের কাজ না করবারই খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত। নিরঞ্জন মনে-মনে হেসে উঠল। নিজেকে সুখী রেখেছে সে কতো সহজ উপায়ে! সে সুখী। নির্মলের চাইতে সুখী। তুলনা করতে নির্মলকেই সে সামনে পায়। আর যাঁরা ছিল তারা আজ সরকারী কর্মচারী অথবা দালাল, ঠিকেদার—তাদের সঙ্গে মস্ত ব্যবধান তার—পয়সার ব্যবধান, মনের ব্যবধান। নিরঞ্জন জানতেও চায় না তারা সুখী কি না।

এলোমেলো ভাবনাটা থামিয়ে দিয়ে নিরঞ্জন আবার স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে সচেতন হল। হঠাৎ তাকে দেখে সুপ্রিয়া কী বলবে? ঠাণ্ডা, নিস্পৃহ গলায় কিছু বলবে কী, না অভ্যর্থনা জানাবে। অভ্যর্থনা না জানালেও টাকাটা হয়ত দেবে সুপ্রিয়া আর টাকাটা-ই ত তার চাই। টাকা চাওয়ার ভাষাটা মনে-মনে গুছিয়ে নিতে লাগল নিরঞ্জন।

সুপ্রিয়া এলো।

"আপনি? আমি ভেবেছিলাম বুঝি কেউ মেয়ের কলেজ-ভর্তির কথা নিয়ে এসেছে।" সুপ্রিয়া বসবার উদ্যোগ করেই উঠে গেল পাখার সুইচে: "ফ্যানটা ছেড়ে দিয়ে যায় নি! আর আপনিও চুপচাপ বসে আছেন এই গরমে!"

"গরম আর কোথায়?" নিরঞ্জন হাসতে চাইল: "এম্নিতেই ত হাওয়া দিচ্ছিল!"

"এখানে বসুন—চেয়ারটাতে হাওয়া লাগবে না তত।" সেটি দেখিয়ে দিলে সুপ্রিয়া ঘাড় নেড়ে।

নিরঞ্জন উঠে গিয়ে বসল। সুপ্রিয়া দাঁড়িয়েই আছে। নিরঞ্জন তাকে বসতে বললে না, আসার কথাটাই সেরে নিতে চাইল।

"এসেছি একটা জরুরী দরকারে। ত্রিশটা টাকা চাই। রেবার মার হয়ত একটা অপারেশন করতে হবে—টাকাটা তার দরকার।"

"কী হয়েছে?" সুপ্রিয়া শঙ্কিত দেখালে।

"সম্ভবত সেপ্‌টিক অ্যাপেণ্ডিক্স।"

"আপনি বসুন। আমি আসছি।" সুপ্রিয়া চলে গেল।

কপালে ঘাম ছিল না তবু কপাল মুছল নিরঞ্জন। যেন একটা ফাঁড়া কেটে গেল। কিছুই নয় তবু কতো আকাশ-পাতাল ভেবেছে সে! আসলে সুপ্রিয়াকে হয়ত সে ঠিক চিনতে পারছে না। সব সময়েই তার অনুমানের বাইরে চলে যায় সুপ্রিয়া।

ফিরে এলো সুপ্রিয়া। হাতের মুঠো খুলে টাকাটা নিরঞ্জনের হাতে দিয়ে বললে: "মা আসছেন। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান।"

সুপ্রিয়া চেয়ারে বসল। নিরঞ্জন টাকাটা পকেটে রেখে বললে: "ওঁর সঙ্গে কী আলাপ করব আমি?"

"তা আমি কী জানি?" সুপ্রিয়া নিঃশব্দে হাসছে।

"বর্ষীয়সীদের সঙ্গে আলাপ করা বিপদ—বড্ড সাবধানে কথা বলতে হয়!"

"সব মেয়ের সঙ্গেই সাবধানে কথা বলতে হয়।"

"কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা বলতে ত আমি সাবধান থাকি নে।"

"নিশ্চয় থাকেন, নইলে আপনার সঙ্গে আমি কথাই বলতাম না!"

নিরঞ্জন চুপ করে গেল। সুপ্রিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চাইল কথাটার ওজন কতোটুকু—কতোটুকু ব্যবধান রচনা করতে পারে কথাটা তা বুঝতে সুপ্রিয়ার চোখ-মুখের রেখা তন্নতন্ন করে যেন বিচার করা দরকার। কিন্তু বিচার করল সে নিজেকেই: আমি ত কখনো ভুলে যাই নে যে সুপ্রিয়ার একটা পদমর্যাদা আছে। সুপ্রিয়া-ই ঠিক। 'আমি ত সাবধান থাকি নে' বলে নিরঞ্জন সুপ্রিয়ার পদমর্যাদাটা ঘুচিয়ে দিতে চাচ্ছে। আজ সে অসাবধান হয়েছে। দুঃখিত হল নিরঞ্জন। সুপ্রিয়াও কথা বলছে না।

মা আসছেন। সুপ্রিয়া ফর্সা করে তুলল মুখ।

"মা এসেছেন—এই যে মা নিরঞ্জনবাবু।"

নিরঞ্জন ভাবছিল একটা প্রণাম করা যায় কি না। মা নিরঞ্জনের কাছাকাছি সেটিতে বসলেন। নিরঞ্জন কোলে হাত গুটিয়ে নিলে।

"আপনার কথা শুনেছি কুন্তলার মুখে—" মা সুপ্রিয়ার দিকে তাকালেন: "ওর মুখেও শুনেছি!"

নিরঞ্জন অসহায়ের হাসি হাসল: "শুনবার মতো কী আছে আমার!"

মা এবার সুপ্রিয়াকেই বলছেন: "এঁকে চা দিতে বলো!"

সুপ্রিয়া চলে গেল। মা যেন নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন: "শিক্ষিত মানুষের কথা শুনবার মতো নয়?"

"আমাদের আর কতোটুকু শিক্ষা—" আর কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছে না নিরঞ্জন।

কিন্তু তাতেই যেন মা খুশি: "এখন ত কলেজে-পড়া শিক্ষাই —আমাদের দিন ত আর নেই!"

"আমাদের দিন-ও আর নেই—" এখন যেন একটু সহজে হাসতে পারছে নিরঞ্জন।

মা অন্য কথায় চলে গেলেন: "শুনলাম না কি আপনি একা থাকেন—বাবা-মা কোথায়—দেশে?"

"তাঁরা বেঁচে নেই। দাদা-বৌদিরা আছেন পূববাংলায়।"

"সেখানে আছেন?"

"আছেন—কলোনীতে এসে থাকার চাইতে ভালো আছেন!"

মার আপত্তি নেই, বিষয় বদলালেন: "দাদা-বৌদি আছেন আর ভাই-এর বিয়েটা তাঁরা দেখলেন না!" হাল্কাভাবে হাসলেন তিনি।

"স্বদেশী করতাম—তাদের গরজ ছিল না।" অভিযুক্তের পক্ষ নিয়ে নিরঞ্জন উত্তর দিতে পারল।

"স্বদেশী করলে কি বিয়ের গরজ থাকে না!"

নিরঞ্জনের নিজের গরজের খবর চাইছেন মা—তাই একটু ইতস্তত করতে হল তাকে: "গরজ তেমন একটা কিছু ছিল না। মানে ওদিকটাই তখন ভাবি নি।" বলেই ভাবল নিরঞ্জন, যদি প্রশ্ন হয়: 'এখন ভাবতে বাধা কী?' তাহলে কী উত্তর আছে? উত্তর নেই। শঙ্কিত হল সে।

কিন্তু মা সে প্রশ্নে গেলেন না। নিস্পৃহ গলায় বললেন: "দেশের শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা বিয়ে করবে না—কী হবে দেশের! আপনারা ত দেশের জন্যে ভাবেন!"

"রোজগারের পথ নেই—তাই বিয়েতে ভয় পায় ছেলে-মেয়েরা!"

"রোজগার করলেও কী বিয়ে করতে চায়? ও একটা বাতিক।"

অর্থনীতির অধ্যাপিকার মাকে অর্থনীতি বোঝাবার দরকার থাকলেও নিরঞ্জন সেদিকে গেল না। স্বীকার করে নিল মার কথাটা: "বাতিকও বলতে পারেন। আমাদের সময়কার বাতিক —ঠিক এখনকার নয়। এই ত কুন্তলা বিয়ে করছে। ভালো বর।"

কলের পুতুলের মতো ঘাড় নাড়লেন মা। কথাগুলো তাঁর মনঃপূত হল কি না ঠিক বুঝতে পারল না নিরঞ্জন তাই আবার বলতে শুরু করল: "অনেকেরই বড় কিছু করার ইচ্ছে নেই—তাদের বিয়েই ভালো।"

"আপনারা স্বাধীনতা এনেছেন—বড় কাজ আপনাদের ছিল কিন্তু এখন কী?"

রাজনীতি-আলাপের সুযোগ ছিল কিন্তু কে এখন এই

বর্ষীয়সী মহিলাকে বোঝাবে যে স্বাধীনতাকে আনা যায় না, স্বাধীনতা আসে! নিরঞ্জন তাই প্রশংসাটা হজম করতে লাগল চুপ করে।

"বিদেশে যাবার এক হিড়িক উঠেছে—" মা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন না: "কোন্ স্বর্গটা আছে বিদেশে? ফিরে এসে এমন কী রাজমুকুট পাবে?"

সুপ্রিয়াকে যে-প্রশ্ন করতে পারতেন মা তা নিরঞ্জনকে কেন, সে বুঝে উঠতে পারল না। কিন্তু উত্তর একটা দিতে হবে বলেই সে বললে: "শিখতে চাইলে বিদেশে যাওয়া দরকার বই কি!"

"মানুষ সারা জীবনই শিখবে—ঘরসংসার করবে না?"

"ঘরসংসারে মতি হলে নিশ্চয় করবে।"

"কোথায় আপনারা ঘরসংসার করছেন—মতি আর কবে হবে?"

কথাটায় চমকে উঠতে পারত নিরঞ্জন কিন্তু স্থির থেকেই বলতে পারল সে: "আমাদের মতো যারা অনিশ্চিত আয়ে বেঁচে আছে, তাদের ঘাড়ে বিয়ের মতি যেন কোনোদিন না চাপে, সে আশীর্বাদই করুন।"

মৃদু হেসে মা চুপ করে রইলেন। নিরঞ্জন তাঁকে ভাববার অবকাশ দিতে চাইল না, আবার বলতে শুরু করলে: "তাছাড়া আজকাল বিয়ে করে কেউ তেমন সুখী হতে পারছে না। আপনাদের দিনকাল আর নেই। আমরা ত সব যন্ত্র—কেউ কথার যন্ত্র, কেউ লেখার যন্ত্র, কেউ কাজের যন্ত্র।"

মা তাঁর চেহারার নিস্তেজ ভঙ্গীটির সঙ্গে গলা মানিয়ে

বললেন: "যন্ত্র হওয়াটা কি ভালো?"

"ভালোমন্দ না ভেবেই হতে হবে।"

"মানুষ মানুষের মতো থাকবে না, এ কেমন বিধান?"

"থাকতে পারছে না এ ত পথেঘাটেই দেখতে পাওয়া যায়!" নিরঞ্জন বিধানের ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে চাইল না।

"শুধু পথেঘাটে কেন, বাড়ি-ঘরেও কি মানুষ মানুষের মতো থাকছে?"

নিরঞ্জন বুঝতে পারছে এই মহিলার মনে বিয়ে না করাটাই মনুষ্যত্বের অধঃপতন—আর কিছু নয়। পাছে তিনি সরাসরি আবার সে আলাপে এসে পড়েন তাই সে কোনো আপত্তি না রেখে তাঁকে সমর্থন জানালে: "হ্যাঁ, সবই বদলে গেছে।"

"হবে না কেন? পরিবার সমাজ সবই আজকাল আপনারা ভেঙে দিতে চান—তাহলে কি আর মানুষ মানুষ থাকে?" বৈধব্যের সাধারণ বিষণ্ণতা ছাপিয়ে আর একটা বিষণ্ণতা যেন অস্পষ্ট করে তুলছে মার মুখ।

"রাখবার ক্ষমতা নেই বলে অনেক সময় ভাঙা, ভাঙবার ক্ষমতা আছে বলে নয়।" নিরঞ্জন-ও গম্ভীর হয়ে উঠল: "অন্যের কথা জানি নে, আমি নিজের কথাই বলতে পারি। মানুষ হলে কেউ নিজের ঘরে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না—তাকে ছুটে বেরিয়ে যেতেই হবে। কিন্তু আমি চুপচাপ ঘরে বসে থাকি।"

মা যেন এই প্রথম নিরঞ্জনের শক্ত ভারি তামাটে মুখের দিকে পুরোপুরি একবার তাকিয়ে দেখতে চাইলেন। খুবই অপরিচিত মনে হল তাকে। তাঁর চেনা-জানার দলের কেউ নয়। তিনি কথা বলতে পারলেন না।

নিরঞ্জন লজ্জিত হল। রাগ বা অভিমান যা-ই তার কথায় মিশে থাকুক, তার মনে হল, এ যেন তার স্থান নয়। এ মহিলাকে এতোটা আপন ভেবে নেওয়ার অধিকার কি তার আছে? অথচ আপন ভেবে নিয়েছে সে। নইলে এ আবেগের কী মানে হয়? এবার নিজের উপর পাহারা রেখে সে বললে: "আমাকে দিয়ে পরিবারের লোকসান তা আমি মানি কিন্তু পরিবার ভাঙবার ক্ষমতা আমার নেই।"

মা যেন দূর থেকে বললেন: "আপনি না ভাঙলেও ভাঙবার লোক আছে। তাদের কথাই বলছিলাম।"

"কিন্তু মুস্কিল যে পরিবার নামটা ভাঙে না—অনেক পরিবার ভাঙতে পারে—কিন্তু গড়েও উঠবে অনেক পরিবার।" নিরঞ্জন হাসি ফুটিয়ে তুলল মুখে।

কিন্তু মার মুখে হাসি ফুটছে না। তিনি অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। আলাপ শেষ হয়ে গেছে, বুঝতে পারল নিরঞ্জন। কিন্তু এখনও বসে থাকতে হবে। চা আসে নি।

"আছে। থাকবে না কেন? অনেক ভালো পরিবার আছে।" মা বললেন, আপন মনে, যেন নিজেকেই শোনাবার জন্যে।

"টাকা-পয়সা থাকলে পরিবারের স্বাস্থ্য মোটামুটি বজায় থাকে।" তত্ত্বকথার মতো শোনাতে চাইল নিরঞ্জন।

"পরিবারের নিয়ম জানা থাকলে পরিবার ভালো থাকে—আপনি ত পরিবারে থাকেন না—"

"একদিন ত ছিলাম—নিয়ম আমি জানি। তবে নিয়ম পালন করতে রাজি হই নি।" নিরঞ্জন হাসল।

"পরিবার ছেড়ে এসে কি খুব সুখে আছেন?"

“পরিবারে থাকলে পরিবারকে সুখী করতে পারতাম না—নিজেকে সুখী করা ঢের সহজ।”

স্বার্থপরের মতো কথা শুনেও মা প্রতিবাদ করতে চাইলেন না। তিনি ত দেখছেন সুপ্রিয়াকে। সুখী করতে চায় ও। স্বার্থপরতাই এখনকার নিয়ম—জানেন তিনি।

চা টোস্ট আর একজোড়া সন্দেশ নিয়ে রাসু ঘরে ঢুকল। তেপায়ার উপর খাবার সাজিয়ে সে চলে গেল যখন, তখন সুপ্রিয়া এলো।

মা বললেন সুপ্রিয়াকে: “এক গ্লাস জল দাও।” উঠলেন তিনি—নিরঞ্জনের মুখে তাকিয়ে বললেন: “আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভালো লাগল।” কিন্তু বললেন না: আসবেন মাঝে-মাঝে। হাসলেন একটু, তারপর চলে গেলেন। সুপ্রিয়া-ও জল আনতে যাচ্ছিল, নিরঞ্জন হাত তুললে: “থাক—জল লাগবে না!”

“খান।” দাঁড়িয়ে থেকেই বলে সুপ্রিয়া।

“খাবো ত নিশ্চয়। দিয়েছ যখন।” নিরঞ্জন সন্দেশ ভাঙতে শুরু করে।

দূরের চেয়ারে বসে সুপ্রিয়া লোভ দেখায়: “সকালে ত এলেন না, আমার হাতে তৈরী চপ খেতে পারতেন।”

“খেতে ত আসি নি—এসেছি আমার গরজে।”

“তা-ই কি?” সুপ্রিয়ার ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে গেল।

“তাছাড়া কী?”

“বলুন এসেছেন রেবার গরজে!”

“না। রেবা তোমাকে টাকা ফেরৎ দেবে না—দেবো আমি।”

"আমি যদি টাকা ফেরৎ না নিই?"

"তাহলে টাকা আমি নেবো না।"

সুপ্রিয়া পাথরের মতো হয়ে গেল। নিরঞ্জন চুপচাপ খেয়ে চলল। পাথরের চোখে জল গড়াচ্ছে—সুপ্রিয়া তাড়াতাড়ি আঁচলে মুছে নিল সে জল। উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়াল। লক্ষ্য করল নিরঞ্জন কিন্তু কিছু বলতে পারল না। বুঝতে পারল না আজ কে বেশি রূঢ়—সে, না সুপ্রিয়া।

খাওয়া শেষ করে নিরঞ্জন বললে: "চলি।"

সুপ্রিয়া ফিরে দাঁড়াল, কথা বললে না।

* * সাত *

সন্ধ্যায় বৌ মার কাছে শুনলেন, নিরঞ্জন এসেছিল। লোক-টিকে যে বৌদির দেখবার ইচ্ছে ছিল তা জানাতে পারেন নি, শুধু জানতে চাইলেন দেখতে-শুনতে তিনি কেমন।

"দেখে ত মনে হয় না চল্লিশ হয়েছে—" মা বললেন।

"কথাবার্তায় বেশ ছটফটে, না?"

"এখন কী আর লাজুক কেউ আছে!"

বয়েসে বৌদি এখনকার দলে পড়েন কাজেই তিনি বিষণ্ণ হলেন। মা বৌদিকে খেয়াল করলেন না—নিরঞ্জন সম্পর্কে তাঁর মতটা স্পষ্ট তাকে শোনাবেন কি না ভাবলেন। বৌকে শোনান মানেই সুপ্রিয়ার কানে দেওয়া—তা-ও ভাবলেন তিনি। ভাবতে হল সুপ্রিয়ার মর্জিকেও। শেষে বললেন: "কথাবার্তায় মনে হল ছেলেটি ভালো।"

নিরঞ্জনকে নিয়ে এখনও তিনি হয়ত তেমন ভাবেন নি, ভাবতেই যেন নিজের ঘরে চলে এলেন।

ঘরের এক কোণে ঠাকুর আছেন। প্রদীপ জ্বালা হয়েছে। অন্য দিন এ-সময়টাতে মা সদ্‌গুরু-কাহিনী পড়েন। আজ যে পড়ায় মন বসবে না বিকেল থেকেই জানা। বৌমার সঙ্গে আলাপ করে নিরঞ্জনের বোঝাটা মন থেকে নামিয়ে ফেলতে চেষ্টা করেছিলেন। হল না। মন খুলতে পারলেন না তিনি।

ঠাকুর প্রণাম সেরে বিছানায় এসে গা এলিয়ে দিলেন মা। তাঁর নিঃসঙ্গতা-বোধটা যেন আজ অতি অসহ্য মনে হচ্ছে।

সুপ্রিয়ার উপর যতোটুকু অধিকার ছিল, তাও যেন আর নেই।

সুপ্রিয়ার বিয়ে হয়ে গেলে কি এমন মনে হত তাঁর? না। তখন তিনি নিজেই অধিকার ছেড়ে দিতেন। বঞ্চিত হবার কোনো ব্যথাই বাজত না। রাগ নয়, বিদ্বেষ নয়—সুপ্রিয়ার উপর অভিমান হল তাঁর। আপনজন বেছে নিয়েছে মেয়ে, মাকে আর আপন ভাবে না বলেই।

পুরুষের উপর মেয়েদের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ সে-আকর্ষণে সুপ্রিয়া নিরঞ্জনকে বেছে নিয়েছে কি না মা ভাবতে চাইলেন। আকর্ষণ করবার মতো নিরঞ্জনের কী আছে? তাছাড়া এ-আকর্ষণকে ত সুপ্রিয়া ভালো চোখে দ্যাখে নি কখনও। নিরঞ্জন তার আত্মীয় হয়েছে—এ-কথাই ঠিক। কিন্তু তিনি যা ঠিক ভাববেন, সবার ভাবনাই যে তা হবে এমন ত নয়। নিরঞ্জনের সঙ্গে সুপ্রিয়ার মেলামেশাটা বাইরের লোক সহজ অর্থেই নেবে। দশ-পাঁচটা মেয়ে যা করে তা-ই করছে সুপ্রিয়া, ভাববে তারা। সুপ্রিয়াকে ত সবাই জানে না।

তিনি কি জানেন? তিনি ত মা। মা ত মেয়েকে সব চাইতে বেশি জানেন। কিন্তু তিনি কি ভাবতে পেরেছেন নিরঞ্জনের মতো কেউ সুপ্রিয়ার জীবনে আসবে! খুবই সাধারণ একটি ছেলে। তার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে আসে সুপ্রিয়া কিসের আকর্ষণে? তিনি ত আগাগোড়া জানতেন সুপ্রিয়ার দৃষ্টি উঁচুর দিকে! সুপ্রিয়া কি সাধারণ হয়ে সাধারণের মতো গড়াগড়ি দিচ্ছে না?

মা শোকার্ত হলেন। কাউকে তিনি বলতে পারবেন না এ-কথা। আজ স্বামী নেই—যার কাছে বলা যেতো, সে নেই

আজ। সুব্রতকে বলতে পারবেন না তিনি—সুপ্রিয়ার কোনো কাজেই ভুল দেখতে পায় না সে। সুপ্রিয়াকে কোনো প্রশ্নও করতে পারেন না—ভয় হয় পাছে অপ্রিয় কথা শোনেন।

মার চোখে জল এলো—স্বামী তাঁকে এমন নিঃসঙ্গ করে দিয়ে গেছেন!

নিঃসঙ্গতায় সুপ্রিয়া-ও ভুগছিল বিকেল থেকে। নিরঞ্জন যখন চলে গেল তখন সুপ্রিয়ার মনে হয়েছিল হঠাৎ সে একা হয়ে গেছে। ঘরে এসে স্নান করল সে বেরোবে বলে। রাস্তায় খানিকটা হেঁটে এলে হয়ত এই নিঃসঙ্গতার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে—ভাবলে সুপ্রিয়া।

রাস্তায় বেরিয়ে ট্রামে এস্‌প্ল্যানেড ঘুরে আসবার ইচ্ছা হল। হেঁটে সময় কাটানোর চাইতে এই ভালো। তাছাড়া হাঁটতে গেলেও নিঃসঙ্গতা সঙ্গে যেতে পারে কিন্তু ট্রাম-বাসের ভিড়ে নিঃসঙ্গ হবার উপায় নেই। সুপ্রিয়া ট্রাম ধরল।

ও'রা বোধ হয় স্বামী-স্ত্রী, একটা সীটে বসেছিলেন। স্বামীটি উঠে সুপ্রিয়ার জায়গা করে দিলেন। কৃতজ্ঞতায় ভদ্রলোকের দিকে তাকাতে গিয়ে সুপ্রিয়া লক্ষ্য করল ইনি নিরঞ্জনের বয়েসী। তার মনে পড়ল, এম্নি ট্রামে পাশাপাশি সে আর নিরঞ্জন অনেকদিন বসেছে। কিন্তু আজ আর সে বসতে পারবে না। নিরঞ্জনের স্পর্শটা স্মরণ করতে গিয়েও যেন দুঃসহ মনে হচ্ছে তার।

স্পর্শটা যদি সে বাঁচাতে পারত! স্পর্শ যেন শরীর দিতে চাওয়া—যেন সমর্পণ! কেন যে তা সমর্পণ হবে বুঝতে পারে না সুপ্রিয়া কিন্তু মনে হয় তা সমর্পণ ছাড়া নয়। পুরুষ

মেয়েদের শরীর পেতে চায়—মেয়েদের যেন দান করা ছাড়া কোনো ভূমিকা নেই! মেয়েও ত পুরুষের শরীর চাইতে পারে। চাওয়াটা দু'তরফের হবে না কেন?

যুক্তি দিয়ে সুপ্রিয়া নিজেকে অবিচল রাখতে চাইল কিন্তু তবু মনে হল নিরঞ্জন তার অনেক ক্ষয়-ক্ষতি করেছে। নিজের শরীরকে অনুভব করবার যেন দরকার ছিল না তার—অনুভব করতে হচ্ছে। এই ত ক্ষতি—এই ত মনকে অনেকটা ক্ষয় করে ফেলা! হেনাকে মনে পড়ল সুপ্রিয়ার নিরঞ্জনের পাশাপাশি। আজই নিরঞ্জনকে হেনার মতো মনে হল—নিজেকে তফাতে সরিয়ে নিয়ে নিরঞ্জনের দিকে তাকাতে পারল। আজ যেন অধিকার দাবী করতে এসেছিল সে।

সুপ্রিয়া কি অধিকৃত? ভাবতেই চোখে জল এসেছে তার। কিন্তু জল আসা উচিত হয় নি। তাকে কাঁদতে হল? কান্নাটাই ত দুর্বলতা। কেন সে দুর্বল হতে গেল? নিরঞ্জনের জোরের মুখোমুখি সে দাঁড়াতে পারল না।

এই ত সে দিব্যি এক ভদ্রলোকের সীটে বসে এস্‌প্ল্যানেড যাচ্ছে। ভদ্রলোককে সে ত বলতে পারত: থাক, আপনি বসুন। মেয়েদের সুবিধেটুকু ছেড়ে দেবার জোর নেই সুপ্রিয়ার। সে দুর্বল না ত কী! আর এ ত অনিবার্য সত্য যে দুর্বলই অধিকৃত হয়! পাশের মহিলার ছোঁওয়া বাঁচিয়ে একটু সরে বসল সুপ্রিয়া যেন দুর্বলতার ছোঁয়াচ এ ছোঁওয়া থেকেই আসছে।

এস্‌প্ল্যানেডে নেমেই সুপ্রিয়া ফিরতি ট্রাম নিল। এ-ট্রামে মেয়েদের বসবার জায়গা কোনো পুরুষের অধিকার ছিল না। তা ছাড়া কোনো পুরুষ নিজের জায়গা ছেড়ে দিতেও মনোযোগী

হয় নি। দাঁড়িয়ে আসতে পেরে সুপ্রিয়ার যেন ভালোই লাগল আজ। অনেকদিনই দাঁড়িয়ে এসেছে সে কিন্তু আজকের দাঁড়িয়ে আসাটাতে ক্লান্তি নেই বরং তৃপ্তিতে হাল্কা বোধ করল নিজেকে।

দেশপ্রিয় পার্কের সামনে এসে নামল সুপ্রিয়া। ও-পাশের বাড়িটা স্কুল। দশ বছর আগে আমি স্কুলে পড়তাম—মনে মনে বললে সে। পার্কের দিকে হাঁটতে লাগল, যদিও সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পরিচিত পামগাছগুলো—তার পাশেই দোলনা—বাচ্চাদের ভিড়, ছবিটা স্পষ্ট ভাবতে পারছে সুপ্রিয়া এগিয়ে যেতে যেতে।

ঝি-আয়ার মেলা—কচি বাচ্চাদের আগলে বসে আছে। আজ একশো আট ডিগ্রী উঠেছিল হয়ত—সন্ধ্যায় ভিড়টা বেশি জমেছে। দুটো শালোয়ার-পরা মেয়ে দোলনায় দুলছে, মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সুপ্রিয়া তাকিয়ে চারদিক দেখতে লাগল। নানা বয়সী মেয়েরা যেন তারই একেকটা ছবি। এ-দশবছরে কিছুই ত বদলায় নি—কনুই-ছোঁয়া আঁটো-হাত ব্লাউজের নক্সা ছাড়া সবই যেন এক। দেখছিল সুপ্রিয়া—ছোট ছোট মেয়েদের দেখে নি সে কতোদিন!

একটা তুলতুলে বাচ্চা মেয়ে ঝির কোল ছেড়ে টলতে টলতে এসে সুপ্রিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। সুপ্রিয়া উবু হয়ে ওর ছড়ানো হাত দুটো ধরে বললে: "তুমি কে গো?"

বাচ্চা সুপ্রিয়ার মুখে তাকিয়ে হয়ত ভুল বুঝতে পারল—ঠোঁট ভেঙে অম্নি কান্না জুড়ে দিল। কোলে তোলা ছাড়া আর উপায় দেখলে না সুপ্রিয়া—কিন্তু কান্নায় ওর কামাই নেই। ঝি ছুটে এসে হেসে হাত বাড়াল। ঝির কোলে মেয়েটিকে দিয়েও

তাকিয়ে আছে সুপ্রিয়া। আমি কি ছেলেবেলায় এমন ছিলাম—ভাবলে সে। যেন এইমাত্র ছেলেবেলাকে ছুঁতে পেরেছিল সে মেয়েটিকে কোলে নিয়ে। অনুভব করেছিল যেন নিজের শিশু-শরীর। আর তার মনে পড়ল পার্কে এসেছিল সে বয়েসের যন্ত্রণা ভুলে যেতে।

পার্কের কোণের গেট পার হয়ে ল্যান্সডাউনের মোড়ে আসতেই সুপ্রিয়া একটা মৃদু ফুলের গন্ধ পেলো। চারদিকে তাকিয়ে দেখল—কারো খোঁপার ফুলের গন্ধ নয়—ফুটপাথে ফুলের দোকান। গন্ধটা এতো ভালো যে ফুল কিনবার ইচ্ছে হয়। এগোল সুপ্রিয়া। চাঁপা, রজনীগন্ধা আর বেলফুলের মালা। বৌদি ফুল ভালোবাসেন।—তাঁর জন্যে চাঁপা আর বেলফুলের একটা মালা মার ঠাকুরের জন্যে।

হাতে ফুল নিয়ে সুপ্রিয়া বাড়ি এলো। এ যেন আরেক সুপ্রিয়া। চেঁচিয়ে ডাকল বৌদিকে সিঁড়ির গোড়া থেকেই: "নিতে হয় ত শীগগীর এসো বৌদি—"

সিঁড়ির মুখে ব্যস্ত হয়ে বৌদি হাজির হলেন।

"নাও কনকচাঁপা—খোঁপায় পরবে—বুঝলে?"

বৌদি হাত বাড়িয়ে বললেন: "সভায় প্রধান-অতিথি হতে গিয়েছিলে না কি?"

"আমাকে কেউ ফুলচন্দন দেবে ভেবেছ?" এগোল সুপ্রিয়া: "পয়সা খরচ করে এনেছি।"

"ব্বাবা—এমন সুমতি!" বৌদি হেসে যেন গড়িয়ে পড়বেন।

সুপ্রিয়া মার ঘরে এসে ঢুকল। বাতি জ্বলে নি। ডাকল:

"মা—"

বিছানায় নড়ে উঠলেন মা। সুপ্রিয়া বাতি জ্বালল।

"দ্যাখো কেমন একখানা মালা এনেছি তোমার ঠাকুরের জন্যে।" মালাটা দু'হাতে ছড়িয়ে ধরল সুপ্রিয়া।

মা একপলক তাকিয়ে বললেন: "রেখে যাও।"

"শুয়ে আছো যে, শরীর ভালো নেই?" টেবিলে মালাটা রেখে বললে সুপ্রিয়া।

শোয়া থেকে উঠে বসেন মা: "মাথা ঘুরছিল।"

"ব্লাডপ্রেশার। দাদা আছেন?"

"দাদাকে কেন? আর ব্লাডপ্রেশার বা হতে যাবে কেন?"

"ডাক্তার দেখে যাক একবার।"

"কী মুস্কিল! মাথা আমার ঘোরে নি। তুমি যাও। বাতিটা নিভিয়ে যেও।" মা সুপ্রিয়ার মুখে তাকালেন না।

সুপ্রিয়া বাতি নিভিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে এলো। মার অসুখ। ভাবতে গিয়ে ভাবলে সে রেবার মার সেপটিক অ্যাপেণ্ডিক্স। যদি না বাঁচেন, কী করবে মেয়েটা?

রেবার মা যদি না বাঁচেন, টাকা চাওয়ার দায় হয়ত ঘুচবে রেবার কিন্তু আমার দায় কি ফুরোবে—যাদবপুর থেকে ফেরার পথে ভেবেছে নিরঞ্জন—হোটেলের কেবিনে বসে ভেবেছে—এখনও ঘুমের আগে ভাবছে। রেবা অসহায় নয়। কলোনীর লোকরা ভালো—রাজনীতিতে সুবিধে করতে না পারলেও সমাজনীতিতে বেশ এগিয়ে গেছেন। হাসপাতালের ব্যবস্থা করেছেন—পয়সা লাগবে না। নিরঞ্জনের দরকার আর নেই।
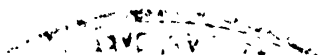
রেবা যদি ভাবতে পারত, নিরঞ্জনের আর দরকার নেই তাহলেই হয়ত তার দায় ফুরোত। কিন্তু রেবা কি তা ভাববে কখনো? আর আমি-ও কি ভাবতে পারব? যেদিন পারব সেদিন হয়ত কেশবকেও ভুলে যেতে হবে।

শেষ পর্যন্ত কেশব কী পাগলামিই না করে গেল! সে জানত রেবা বিয়ে করবে না, তবু আমাকে বিয়েতে রাজি করাবার কী চেষ্টাই না করেছে! তার মৃত্যুর কারণ হয়ত আমি—রেবা নয়। বিয়ে যদি আমি করতামও, রেবাকে বিয়ে করতে পারতাম না। কিন্তু রেবা কি জানে আমি যে তাকে বিয়ে করতে পারি নে? নির্মল ভাবে, আমি রেবাকে বিয়ে করব। রেবা-ও কি ভাবে?

নিরঞ্জন ভেবে চলছিল রেবাকে। যেন সুপ্রিয়াকে আড়ালে রাখবার জন্যেই রেবাকে মনের উপর তুলে ধরছে। কিন্তু সুপ্রিয়া আড়ালে থাকতে চাইল না—রেবাকে আড়াল করে এসে সে দাঁড়াল। এতো রূঢ় হবার কোনো মানে ছিল না—যেন সুপ্রিয়াকেই নিঃশব্দে বললে নিরঞ্জন।

সুপ্রিয়া তাকিয়ে আছে—তার চোখে জল।

কান্নাকে আমি ভয় করি—নিরঞ্জন বলতে লাগল—মনে হয় আমার অপরাধের ছবি দেখছি।

চোখের জল মুছে ফেলছে সুপ্রিয়া।

অপরাধ করবার সাহস আমার হল কেন—তুমিই তার সুযোগ দিয়েছ, সুপ্রিয়া। রেবার মুখে সুপ্রিয়ার মুখ মুছে গেল নিরঞ্জনের চোখের অন্ধকারে।

চোখ বুজিয়ে ছিল নিরঞ্জন, চোখ মেলে তাকাল। অন্ধকারটা
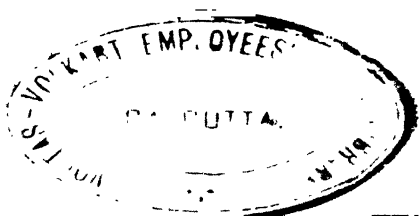
জমাট নয় ঘরে। রাস্তার আলো ছিটকে চলে আসে। এই পাতলা অন্ধকারে রোজ সে সুপ্রিয়াকে ভাবে—রেবাকে ভাবে না। সুপ্রিয়ার একটা ছবিই সে ভাবে—এই অন্ধকারে যে-ছবি একদিন সত্য ছিল। সুপ্রিয়ার তা প্রথম পুরুষ-স্পর্শ কি না জানে না নিরঞ্জন, কিন্তু নিরঞ্জনের তা-ই প্রথম নারী-স্পর্শ।

আলো জ্বললে নিরঞ্জন দেখেছিল সুপ্রিয়ার ফ্যাকাশে মুখ। যেন মৃত্যুর হাত থেকে পাওয়া আর্ত জীবন। যেন নিষ্ঠুরতায় বিষণ্ণ হতে হয়েছিল নিরঞ্জনকে।

পুরুষের ছোঁওয়ায় নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছু নেই—নিরঞ্জনের মনের উপর কথাটা ভেসে বেড়াতে লাগল। তার শেষ নেই বলেই সভ্যতার নিষ্ঠুরতার শেষ হবে না—মাথায় পাক খেতে লাগল কথাটা। মেয়েদের হাতে কি সভ্যতা কোনোদিন গড়ে উঠবে—একদিন সুপ্রিয়াকে বলেছিল নিরঞ্জন, সে-কথাটাই শুনল এখন। সাবধানে সুপ্রিয়ার সঙ্গে কথা বলতে হয়—ভেবে সে হাসল মনে-মনে। হয়ত বাইরের কথাটাই সব—ভেতরে যা-ই থাক না কেন!

নিজেকে গোপন করতে শিখছে নিরঞ্জন—হয়ত সুপ্রিয়াই শিখিয়েছে তাকে। সুপ্রিয়ার সঙ্গে চলতে তার কষ্ট হয়, তবু চলতে হবে—এই তার তৈরী নিয়তি।

নিরঞ্জন চোখ বুজিয়ে নিল আবার।

* * আট *

রেবার মা বাঁচলেন না। অপারেশন হয়েছিল কিন্তু সেপ্‌সিস্‌ আটকানো যায় নি। হাসপাতাল থেকে মৃত্যুসংবাদ নিয়ে কলোনীর একটি ছেলে নিরঞ্জনের খোঁজে এসেছিল কিন্তু তাকে পায় নি। ঘরে তালা। টিউশনিতে গিয়েছিল নিরঞ্জন।

তিনদিন পরে রেবা নিজেই এলো। দুপুরবেলা রোদে পুড়ে। মুখের শীর্ণতা ঘামে ভিজে যেন একটু উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

অপারেশনের দিন পর্যন্ত খোঁজ নিয়েছিল নিরঞ্জন, তারপর আর সে কিছু জানে না। জানল রেবার উচ্ছ্বসিত কান্নায়। ঘরে ঢুকেই রেবা কান্নায় ভেঙে পড়েছিল, নিরঞ্জন তটস্থ হয়ে তাকে ধরে এনে চেয়ারে বসিয়ে দিলে।

"মা নেই নিরঞ্জনদা—বাঁচাতে পারলে না ওরা—" কান্নায় জড়িয়ে বললে রেবা।

রেবার মুখে স্থির তাকিয়ে নিরঞ্জন বললে: "আমাকে খবরটা-ও দিলে না!"

"খবর দিতে এসেছিল, আপনাকে পায় নি।" রেবা শান্ত করে আনল নিজেকে।

"কবে ঘটল এ-ঘটনা ?"

"পরশুর আগের দিন।"

"হুঁ।" নিরঞ্জন মেঝেতে চোখ নিয়ে গেল।

"আমি এখন কী করব, নিরঞ্জনদা ?"

কী করবে রেবা তা-ও কি নিরঞ্জনকে ভাবতে হবে? এ প্রশ্ন নিরঞ্জনকে কেন?

"পাশের বাড়ির বৌদি এসে তিনদিন থাকছেন কিন্তু এ তো আর চলতে পারে না।"

আবার রেবার মুখে চোখ নিয়ে গেল নিরঞ্জন। কাতর, অসহায় মুখ।

"আমি কী বলব বলো!" নিরঞ্জনও অসহায় মুখে বললে।

"আপনি না বললে কে আর বলবে। কে আছে আমার!" কান্নায় আবার বুঁজে এলো রেবার গলা।

অপরাধে অভিযুক্তের মতো নিরঞ্জন মাথা নিচু করে বললে:

"কেঁদো না।"

কিন্তু এ-কথায় সান্ত্বনা কোথায়? রেবা চেয়ারের পিঠে আঁচল জড়িয়ে মুখ গুঁজল।

রেবার সংগে ব্যবহারে যে শুষ্কতা অভ্যাস করেছিল নিরঞ্জন তা যেন খানিকটা ভিজে-ভিজে হয়ে এলো। বিছানা ছেড়ে সে উঠে গেল রেবার কাছে—চেয়ারের পিঠেই হাত রাখল তারপর নম্র গলায় বললে: "ছেলেমানুষের মতো কাঁদাকাটি করতে আছে? ছিঃ!"

রেবা একটু চোখ তুলে নিরঞ্জনের হাত দেখতে পেল—হাতটা সে জড়িয়ে ধরল তার কান্না-মুখে। এ-ই যেন তার বাঁচবার অবলম্বন।

চোখের জলে ভিজে উঠছে নিরঞ্জনের হাত। ভিজতে দিল সে। তার পংগু অক্ষম জীবনের পুরস্কার যেন সে হাত পেতে নিচ্ছে আজ। দেশের স্বাধীনতা চেয়েছিল সে—একটি মেয়ের

স্বাধীন জীবন যে তৈরী করে দিতে পারে না, সে চেয়েছিল তেত্রিশ কোটির স্বাধীনতা! কী হাস্যকর স্পর্দ্ধা!

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল নিরঞ্জন। কাঁদুক রেবা। কান্নার দরকার ছিল হয়ত তার। কলোনীতে শক্ত মেয়ে রেবা। হয়ত কাঁদতে পারে নি।

রেবা কাঁদল তারপর একসময় মুখ তুলে নিয়ে আঁচলে বার-বার ঘষতে লাগল চোখ। নিরঞ্জন সরে এলো বিছানায়। তৈরী হল কথা বলতে। বললে সে: "এদিকে তোমার একটা কাজ দেখতে হবে। আমরাও দেখব, তুমিও দেখো। তারপর কোনো মেয়ে-বোর্ডিং-এ থাকবে এসে। কিন্তু যতোদিন তা না হচ্ছে—ওখানেই কোনো ব্যবস্থা করে থাকতে হবে—ইস্কুলে পড়ে-টড়ে এমন কোনো ছেলে রাত্তিরে এসে থাকতে পারে। যাঁরা তোমাকে এতো সাহায্য করেছেন—তাঁরা নিশ্চয়ই এ-ব্যবস্থা-ও করে দিতে পারবেন। কতো অসুবিধেয় ত মানুষ থাকে—দেখছ ত!"

নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে রেবা বললে: "জানি। হয়ত আপনাকে আমি অসুবিধেয় ফেললাম।"

"নাঃ, আমার কী অসুবিধে?" নিরঞ্জন রেবাকে বুঝতে পারল না।

"আমার জন্যে এদিকে কাজ খুঁজতে হবে!"

নিরঞ্জন তার স্বাভাবিক শুষ্কতায় ফিরে এলো: "কাজ খুঁজতে হবে। কিন্তু তাতে অসুবিধে হবে কেন?"

"আমার মনে হয় আমি যেন আপনার উপর অন্যায় দাবী করে যাচ্ছি।"

"মনে হওয়াটা খুবই অন্যায়।" হাসলে নিরঞ্জন, শুকনো হাসি, তারপর বললে: "দুঃখ ত কম পাও নি জীবনে, মিছে ভাবনা ভেবে কেন তার বোঝা বাড়াও ?"

"মিছে ভাবনা ত নয়। আমি, সত্যি, আপনাকে অনেক বিরক্ত করেছি।"

"আমি যদি বিরক্ত না হই তুমি কী ভাবে আমাকে বিরক্ত করবে ?"

রেবা ঠোঁট কামড়াতে লাগল কি যেন বলতে চেয়েও সে বলতে পারছিল না।

নিরঞ্জন সহজভাবে বললে: "মনে রেখো, তোমার ভাবনা তোমার একার নয়, আমারও।"

রেবা উজ্জ্বল চোখে নিরঞ্জনের মুখে তাকাল কিন্তু কিছু বলতে পারল না।

নিরঞ্জন মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে: "তুমি ভালো থাকো, তা-ই আমি চাই।"

"আমি ভালো থাকবো!" রেবার সমস্ত মুখে ছায়া পড়ল: "আমি ভালো থাকবো আপনি ভাবতে পারেন ?"

"কেন ভালো থাকতে চেষ্টা করবে না ? দুঃখটাই কী জীবনে সত্য ?"

"কারো জীবনে হয়ত তা-ই।"

"সব সত্যকেই মিথ্যা করা যায়।" বলতে চাইল নিরঞ্জন কিন্তু কেমন-যেন নিষ্প্রাণ শোনাল কথাগুলো।

"সত্যকে মিথ্যা করতে পারি তেমন জোর আমার নেই!" রেবা অন্যমনস্কের মতো জানলায় তাকিয়ে রইল।

“কিন্তু ইচ্ছে করলেই তুমি সুখী হতে পারো—” একটু থামল নিরঞ্জন তারপর হঠাৎ বলে ফেলল: “ধরো তুমি বিয়ে করতে পারো।”

রেবা চোখ ফিরিয়ে নিয়ে এলো নিরঞ্জনের মুখের উপর। রেবার এমন আহত চোখ নিরঞ্জন বুঝি আর কখনো দেখে নি।

“সবাই যা বলবে, আপনি তা-ই বলছেন!” ক্লান্ত গলায় বললে রেবা।

“অবশ্য আমি বলি যদি তুমি বিয়েতে সুখী হতে পারো তবেই—”

“থাক নিরঞ্জনদা—” আর্ত শোনালো রেবাকে।

ওকে অপমানিত করল কি না ভাবল নিরঞ্জন। না, রেবা সুপ্রিয়া নয়। কিন্তু অভিমান ত থাকতে পারে ওর। কে জানে! রেবাও এখনকার মেয়ে। এখনকার মেয়েদের নিরঞ্জন কতোটুকু বুঝতে পারবে? মেয়েদেরই বা কতোটুকু বোঝা যায়!

বিমর্ষ হয়ে নিরঞ্জন বললে: “মোটের উপর আমার বলার ছিল, তোমার সুখ তুমি বেছে নিতে পারো, ইচ্ছে করে নিজেকে দুঃখী করো না।”

“সুখ আর দুঃখ কোনোটাই ইচ্ছাতে হয় না, নিরঞ্জনদা—” বলেই রেবা যেম্নি চুপচাপ ছিল তেম্নি চুপচাপ হয়ে গেল।

সুখ-দুঃখের আলোচনায় নিরঞ্জনের-ও খুব মন ছিল না, সে ভাবছিল যে-কোনো আলাপে রেবাকে টেনে এনে তার কান্না-টাকে ভুলিয়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু কথায় রেবা যতো অস্পষ্টই থাক নিরঞ্জন স্পষ্ট বুঝতে পারছিল, রেবা তার কাছে এমন-কিছু

প্রত্যাশা করে, যা নিরঞ্জন দিতে পারছে না। সান্ত্বনার কথা শুনতে চায় না, হয়ত সান্ত্বনা চায়। আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া চায় না, হয়ত আশ্রয় চায়। ভাবতেই নিরঞ্জন ভয় পেলো। আজ সে রেবার উপর কঠিন হতে পারবে না বলেই ভয়।

ভয়ে-ভয়েই সে বললে: "সুখদুঃখের কথা না-হয় ছেড়েই দাও, মোটামুটি সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে হবে ত—ইচ্ছে হারিয়ে বসলে তা হবে না।"

"বাঁচতে হবে সে ঠিক।" মুখে কালো ছায়া নিয়ে বললে রেবা।

এবার নিরঞ্জন রেবাকে উৎসাহিত করতে চাচ্ছে: "তবু ত তুমি ভালো লেখা-পড়া শিখেছ— ভাবো ত অনেক মেয়ে আছে, যাদের তোমার সুযোগটুকু-ও নেই—"

"কিন্তু তারা কী ভাবে বাঁচে তা আপনি জানেন না—আমি হয়ত তাদের মতো বাঁচব না—এটুকুই সান্ত্বনা।"

"জানো রেবা, আমাদের মতো মানুষদের মন একটা ভয়ানক জিনিস—" নিরঞ্জন অভিভাবকের ভূমিকায় চলে গেল: "এ-মনকে তুষ্ট করা শক্ত। তোমার মন অবশ্যি এখন ভালো থাকতে পারে না—সেখানে উদ্বেগ, ভয়, নিরাশা এসবই আসবে এখন। কিন্তু সুস্থ হলেও, সব সময়ই সাবধান থাকতে হয় মন নিয়ে।"

"আমার মন কোনোসময় বেঁচে ছিল বলে ত আমি জানি নে।"

"তুমি যন্ত্রের মতো কাজ করে গেছ জানি। কিন্তু এখন তা করবে না বলেই মন ফিরে আসবে।"

"ভয়ানক জিনিস ফিরে না আসা-ই ত ভালো।" অস্পষ্ট

হাসিতে রেবা একটু চঞ্চল দেখালে: 'কিন্তু আমি বোধ হয় আপনার কাজে বাধা দিচ্ছি।"

"কাজ? দুপুরবেলা কী কাজ আমার?"

"পড়াশুনো করতেন নিশ্চয়।"

"একদিন তা না করলেও চলে। কিন্তু তুমি ত বললে না এদিকে একটা কাজ পেলে করবে কি না!"

"যেখানেই হয় কাজ ত আমাকে করতেই হবে।"

"ওদিকে থাকার অসুবিধের কথা বলছিলে কি না!"

"আমার মতো যার ভাগ্য অসুবিধে মেনেই তাকে চলতে হয়।"

"এ-কথায় কোনো যুক্তি নেই।"

"আমাকে চলতে হবে—তা-ই ত বড়ো কথা—তাতে যুক্তি থাক বা না থাক।"

নিরঞ্জন রেবার মুখের রেখাগুলো পড়তে চেষ্টা করল। কিন্তু বিষণ্ণতা ছাড়া আর কিছু উদ্ধার করা যায় না। কথা-গুলো যতো দুঃসাহসিকই শোনাক, রেবার মুখে তার ছাপ নেই। ওর মুখে হয়ত মনের ছাপ পড়ে না—ভাবল নিরঞ্জন। সে দুঃখিত হয়ে বলল: "তুমি এমন কিছু করতে পারো না যাতে তোমার সম্মান-হানি হয়।"

"আমার সম্মান!" রেবা কান্নার ভঙ্গীতে হাসল একটু: "আমার সম্মান আছে কিছু?"

"কেন নেই?"

"মানুষের দয়ার উপর যাকে থাকতে হয় সে কি নিজেকে সম্মানিত ভাবতে পারে?"

"রেবা, তুমি জীবনটাকে সহজভাবে নিতে পারছ না।"

"আমার যা জীবন তাকে সহজভাবে কেউ নিতে পারে কি না জানি নে।"

রেবার সঙ্গে এতো কথা কোনোদিন বলে নি নিরঞ্জন আর রেবাও এতো কথা কোনোদিন শোনায় নি তাকে। শোকেই রেবা এমন প্রগল্‌ভ কি আজ? কিন্তু শোকের ঘোর না কাটলে ত জীবনকে মুখোমুখি দেখা যায় না। রেবা তার জীবনকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। কী বলবে নিরঞ্জন? কী বলার আছে তার রেবাকে? তবু সে বলতে চেষ্টা করল: "বেশ ত! কঠিন জীবন নিয়ে চলার-ও ত একটা আনন্দ থাকতে পারে! আমার ত মনে হয় তুমি সে আনন্দ পেয়েছ।"

"যদি তা পেয়েও থাকি—" অস্পষ্ট হয়ে এলো রেবার গলার স্বর: "এখন আর কি করে পাব!"

নিরঞ্জন সহানুভূতিতে নম্র হল: "নিজের জন্যে বেঁচে কেউ আনন্দ পায় না—ঠিক—ক্লান্তি আসে।"

গভীর নিরাশায় একটু হাওয়া আসছে যেন রেবার। বাইরে তাকিয়ে রইল সে চুপচাপ। নিজেকে নিজের নিঃসঙ্গতায় পেয়ে শান্ত হয়ে গেছে তার মন। সেখানে সুখ-দুঃখ কিছু নেই—হয়ত ক্লান্তি আছে। এই ক্লান্তিতেই তার মুক্তি।

নিরঞ্জন সুপ্রিয়াকে ভাবছিল। সাতদিন তার সঙ্গে দেখা নেই। হয়ত চোখের জল মুছতে পারে নি। সুপ্রিয়ার চোখের জল রেবার চোখের জল নয় যে নিরঞ্জন তা ভুলিয়ে দিতে পারবে। সুপ্রিয়া কঠিন বলেই হয়ত তার আকর্ষণ এতো বেশি। সুপ্রিয়াকে ধরতে যাওয়া একটা দুঃসাহসিকতা। এই দুঃসাহ-

সিকতাই যেন নিরঞ্জনকে পঙ্গুতা থেকে, নিঃসঙ্গতার ক্লান্তি থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

রেবা কি তাকে বাঁচাতে পারে? রেবা বাঁচতে চায়। ও আর যার কাছেই কঠিন হোক, নিরঞ্জনের কাছে খুবই সহজ। সহজের সাহচর্যে ক্লান্তি বাড়ে বই কমে না। নিরঞ্জন রেবার মুখে তাকাল। ব্যথিত মুখ নয়। সে তাহলে সত্যি রেবার ব্যথা ভুলিয়ে দিতে পেরেছে! সুখী হল নিরঞ্জন। এটুকুই তার করণীয়। আর কিছু নয়।

রেবা উঠে দাঁড়াল। স্বাভাবিক গলায় বললে: "আমি যাই নিরঞ্জনদা—"

নিরঞ্জনও উঠল: "চলো তোমাকে ট্রামে তুলে দিয়ে আসি—"

"আপনি কেন আর কষ্ট করবেন!"

আপত্তি শুনল না নিরঞ্জন। ব্র্যাকেট থেকে জামা টেনে নিয়ে গায়ে চড়াল।

রেবা আবারও বললে: "মিছিমিছি কেন আসবেন!"

"চলো।" উত্তরে বলল নিরঞ্জন।

যা আর কোনোদিন করে নি সে, আজ তা করল, রেবাকে ট্রামে পৌঁছিয়ে দিতে গেল।

ফিরে এলো নিরঞ্জন নির্মলকে সঙ্গে নিয়ে। যতোক্ষণ তালা খুলছিল নিরঞ্জন, নির্মল বলছিল: "চাকরি না-হয় একটা দেখা যাবে কিন্তু বোর্ডিং কেন? হোটেলে ভাত খাওয়া বন্ধ করো এবার, ঘরের ভাতে ফিরে এসো!"

"এই অন্নসংকটের দিনে?" ঘরে ঢুকে বললে নিরঞ্জন।

নির্মল চেয়ারে বসে সিগারেটে মন দিলে: "যার যার অন্ন সে-ই ত যোগাড় করবে—ভয় কি?"

নিরঞ্জন উজ্জ্বল হেসে বললে: "তাহলে যে ঘরই হোটেল হয়ে দাঁড়ায়।"

হাসতে পারল নিরঞ্জন রেবাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া দরকার বলেই যেন।

স্ত্রীর মুখে নিরঞ্জনের নাম শুনেছিল সুব্রত। শুধু নামই নয়, নিরঞ্জনকে নিয়ে মার আশঙ্কার কথা-ও। সুব্রত ভেবেছে ওরা যদি ভালোবেসে থাকে তাহলে বিয়ে হলে ক্ষতি কি? অবশ্য স্ত্রী যা বললেন তাতে বোঝা গেছে নিরঞ্জনের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়, হয়ত এখানেই বাধা পাচ্ছে সুপ্রিয়া। হয়ত কেন, নিশ্চয়ই। নইলে তার অর্থনীতি পড়ার কী মানে হয়? এ-বাধা সুব্রত কি ভাবে ঘোচাবে! স্ত্রী যতোই বলুন তাকে মধ্যস্থ হয়ে একটা ব্যবস্থা করতে—ব্যবস্থা করা সহজ কথা নয়। সুপ্রিয়াকে সে বিয়ের জন্যে পীড়াপীড়ি করতে পারে না। ভালোমন্দ বুঝবার বয়েস আর শিক্ষা যার আছে—বিয়ে তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাছাড়া পীড়াপীড়িতে সুপ্রিয়া এমনও ত মনে করতে পারে, এ বাড়ির জীবন থেকে দাদা তাকে সরিয়ে দিতে চায়।

কিন্তু চুপ করেও থাকা যাবে না। স্ত্রী প্রায় ক্ষেপে উঠেছেন।

সুব্রত সেদিন অফিস কামাই করল। মার সঙ্গে আলাপ করে দেখা দরকার। সুপ্রিয়া যতোক্ষণ বাড়িতে আছে সে-আলাপ সুব্রত করতে পারবে না। সুপ্রিয়া অবশ্যি কান পেতে থাকবে না কিন্তু যদি এসে আলাপের মাঝখানে উপস্থিত হয়!

অফিসের সময়ে মা ছেলেকে তাঁর ঘরে দেখে একটু চিন্তিত হলেন।

"অফিসে গেলে না—শরীর ভালো নেই ?"

"ছুটি নিলাম—কেমন যেন ক্লান্তি লাগছে।" মার বিছানায় বসল সুব্রত।

"তার মানেই অসুখ করবে হয়ত !"

"না—" সুর টানল সুব্রত: "আমি ত দেখছি তোমার শরীরই খারাপের দিকে চলেছে দিন-দিন।"

"আমার শরীর খুব ভালো আছে—তোমাদের ভাবনা নেই।"

"তুমি আমাদের জন্যে ভাববে আর আমরা তোমার জন্যে ভাবব না ?" সুব্রত হাসতে লাগল।

মা খুশি হলেন। কিন্তু সুপ্রিয়াকে মনে পড়তেই বললেন: "তোমাদের জন্যে ভাবতে দাও কোথায় ?"

"কিন্তু ভাবো ত! জানি তুমি সুপুর জন্যে ভাবছ।"

মা চুপ করে রইলেন।

সুব্রত আর ভূমিকা করল না, সরাসরি জিজ্ঞেস করল: "নিরঞ্জনবাবুকে কেমন দেখলে ?"

"পাঁচ-মিনিটের দেখা কেমন আর দেখব !"

"উকীল-গিন্নীর পাঁচ-মিনিট দেখাই ত যথেষ্ট।" কলরব করে হেসে উঠল সুব্রত।

"পূব-বাংলার মানুষ যেমন হয় তেম্নি মনে হল।" মা স্পষ্ট হতে চাইলেন না।

"ঠাকুর্দা-ও ত পূব-বাংলার ছিলেন—বলতে চাও ঠাকুর্দার মতো ?"

"সেদিন কি আর এখন আছে—"

সেদিনের জন্যে বিন্দুমাত্র-ও আগ্রহ দেখাল না সুব্রত, বললে:

"তাহলে বলো আজকালকার মানুষদের মতোই!"

"ওরা স্বদেশী মানুষ, ওদের রকমই আলাদা।"

সুব্রত তা বিলক্ষণ জানে তাই সেদিকে না গিয়ে সে আসল প্রশ্নে চলে এলো: "ভদ্রলোক বিয়ে-টিয়ে করবেন মনে হল?"

"বিয়ে?" হোঁচট খেয়ে উঠল মার গলা।

"বিয়ের ইচ্ছে আছে কি না বুঝলে না?"

"বৌমা কিছু বললে নাকি?"

"বৌমা বলতে যাবে কেন? ভদ্রলোকের বিয়ের মন আছে কিনা কথাবার্তায় ধরা পড়ল না?"

মা বিরক্ত হলেন। বললেন: "বিয়ে করতে চাইলেও কেউ চেঁচিয়ে তা-ই বলে শুনেছ?"

"চেঁচিয়ে বলার কথা ত বলছি নে—মনের ভাবসাবের কথাই বলছি।"

"মন খুলে কে আর কথা বলতে আসে এখন?"

"আমি কিন্তু মা মন খুলে বলেছিলাম বিয়ে করব।" একটু হাল্কা আবহাওয়া তৈরী করতে চাইল সুব্রত: "কিন্তু সুপু যে কেন বলে না!"

চিন্তিত হলেন মা। চিন্তিত হলেন কোন্ দিন সুপ্রিয়া এসে বলবে, নিরঞ্জনকে সে বিয়ে করেছে। এ-ধরনের মেলামেশায় এম্নি হয়।

আবহাওয়া হাল্কা হল না—সুব্রত আপন মনে তাই বকতে শুরু করল: "এই ত কুন্তলা বিয়ে করছে—বিয়ে করবে না কেন? সুপুও বিয়ে করবে—যদি ভালো মনে করে নিরঞ্জনকেই বিয়ে করবে।" মতটা মন থেকে বার করবার জন্যেই এই আয়োজন।

মা যেন তাঁর আশঙ্কার আওয়াজ শুনলেন। অত্যন্ত মলিন মুখে তাকালেন তিনি ছেলের মুখে: "তুমি ভাবো ও নিরঞ্জনকে বিয়ে করবে?"

"ভাবা ত উচিত।"

"এমন একটা সাধারণ বিয়ে—" মা 'সাধারণ লোকের সঙ্গে বিয়ে' বললেন না।

"অসাধারণ বিয়ে আর কটা হয়?"

"এর চাইতে ত ঢের ভালো বিয়ে হতে পারত!"

"কোন্ বিয়েটা ভালো হবে আগে তা বলা যায় না। একটা তুখোর ছেলে ধরে আনলেই কি বিয়েটা তুখোর হবে ভাবা যায়?"

"ও আমাকে বিশ্বাস করতে পারল না—" মা কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছতে লাগলেন।

"কী মুস্কিল! তোমাকে বিশ্বাস করলেও যে ফল ভালো হত তা ত তুমি বলতে পারো না। তুমি হয়ত এক আই-এ-এস্ ধরে আনলে কিন্তু তার সঙ্গে যে সুপুর বনিবনা হবে তার কী গ্যারান্টি আছে?"

মা সান্ত্বনা পেলেন না। চোখের জল মুছলেন কিন্তু ব্যথায় মন নিঃসাড় হয়ে রইল।

সুব্রতকে তাই আবার কথা বলতে হল: "তুমি যদি মন খারাপ করে থাকো—যদি চোখের জল ফেল—সুপুও ত ভাবতে পারে যে তুমি তাকে বিশ্বাস করছ না! আমরা ত জানি নে নিরঞ্জনবাবু কেমন—ও জানে। ওকেই আমাদের বিশ্বাস করতে হবে।"

মার যেন শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল, তিনি থেমে-থেমে বললেন:

"বৌমাকে পাঠিয়ে দাও ত—ঠাকুরের ভোগটা সাজিয়ে দিয়ে যাক।"

সুব্রত উঠল। যাবার আগেও বললে: "তুমি ভেবো না মা, ওদের বিয়েটা ভালোই হবে। কেউ ত ওরা ছেলেমানুষ নয়।"

ঘরে এসে স্ত্রীকে মা-র ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে সুব্রত দৈনিক পত্রিকা নিয়ে খানিকটা সময় কাটাতে চাইলে। বাজেটের বিতর্কে ভরা কাগজটা—মন বসল না। অগত্যা শুয়ে পড়ল সে চুপচাপ। স্ত্রীর অপেক্ষায় থাকতে হবে নতুবা সদ্য-কেনা ক্রাইম-নভেলে ডুব দেওয়া যেতো।

কিন্তু মনকে চুপচাপ রাখতে পারল না সুব্রত এক মিনিটও। সুপ্রিয়াকে ভাবতে হল। এতোক্ষণ যার বিয়ের কথা সে গড়গড় করে বলে এসেছে এখন তাকে ভাবতে গিয়ে সে-কথাগুলো অনধিকার চর্চা বলে মনে হল তার। কিন্তু এওতো ঠিক যে অনধিকার চর্চা করবে বলেই সে অফিস কামাই করেছে। তবে সে চর্চাতে ফল তেমন কিছু হল না। মাকে জানা গেল, এ পর্যন্ত। আর সেও নিজেকে জানিয়ে এলো মার কাছে। আসল যাকে জানা দরকার আর জানানো দরকার সে-ই রয়ে গেল নেপথ্যে। সুপ্রিয়াকে জানা যাবে না।

এগ্রিকালচারেল ইকনমি ইন মডার্ন ডেমোক্রাসি—কথাগুলো উচ্চারণ করল সুব্রত সুপ্রিয়ার নামের সংগে সংগে। গবেষণার নেশায় আছে সুপ্রিয়া; বলে, তথ্য সংগ্রহের জন্যে ইংল্যান্ড, আমেরিকা যাওয়া দরকার। যাওয়া দরকার ঠিক। দেশের সত্যি-কারের উপকারে আসতে হলে বিদেশের জীবনের সংগে পরিচয় থাকা উচিত। মাস্টারিতে জীবন নষ্ট করবে না—আকাঙ্ক্ষা

অনেক উঁচু। সবই ভালো—সব সহজ কথা। কিন্তু নিরঞ্জনের ব্যাপারটা যেন কেমন গোলমেলে। মা নিশ্চয়ই ভাবছেন নিরঞ্জন সুপ্রিয়াকে নিচুতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সুব্রত তা ভাবছে না। প্রেম সম্ভবত নিচুতে টেনে নেয় না কাউকে। ঠিক জানে না সুব্রত—তবে তাই তার ধারণা। নিরঞ্জনের সঙ্গে তার দেখা হলে ভালো হত। কিন্তু সুপ্রিয়াকে ডিঙিয়ে ত দেখা করা যাবে না আর সুপ্রিয়াকে নিরঞ্জনের কথা বলতে যাওয়াও সুব্রতর পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না। সুপ্রিয়ার ক্ষ্যাপামিকে সে ভয় করে।

সুব্রত ক্রাইম-নভেলটা হাতে তুলে পৃষ্ঠা উল্টোতে লাগল। স্ত্রী ঘরে এলেন।

"মাকে তুমি কী বলে এসেছো, মা যেন কথাই বলতে পারছেন না।" স্ত্রী বললেন।

"মা কম কথাই বলেন—তোমার মতো ত বাচাল নন।" বইটা টেবিলে রেখে সুব্রত স্ত্রীর মুখে তাকাল।

"বেশ, আমি বাচাল আছি—তুমি মার সঙ্গে ওরকম করতে গেলে কেন— নিশ্চয় ভেবেছেন আমি তোমাকে পাঠিয়েছি।"

"তা ভাবলে ত মিথ্যে ভাববেন না।"

"আমি তোমায় পাঠিয়েছি! কী মিথ্যেবাদী তুমি!"

"দিদিভাই-এর চিন্তায় তোমার ঘুম নেই—আমাকে পর্যন্ত ঘুমুতে দাও না—এ সবই মিথ্যে?"

"আমি ত বলেছি দিদিভাইকে জিজ্ঞেস করতে!"

"মা আছেন—আমি কেন জিজ্ঞেস করব?"

"নিজে ত নেচে গিয়ে বিয়ে করেছ আর বোনের বিয়ের কথা বলতেই জিভ জড় হয়ে যায়!"

"তোমার জিভ যদি এতোই লকপক করে তাহলে তুমিই বলো।"

ভুরু কুঁচকোলেন স্ত্রী: "আহা! কথার শ্রী দ্যাখো!"

"বিয়ে ব্যাপারটাই বিশ্রী। তার কথায় শ্রী থাকবে কেন?" সুব্রত দার্শনিক ভঙ্গীতে বললে।

"কতো ছাইভস্মই না বলতে শিখেছ তুমি—" স্ত্রী কুপিতা হলেন: "বিয়েটা বিশ্রী হলে দিদিভাই-এর মতো থাকলেই পারতে —বিয়ে করতে কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল?"

"বিয়ে যে বিশ্রী বিয়ে না করলে কি বোঝা যায়!" হাসল সুব্রত।

"তোমার আড্ডায় গিয়ে ওসব কথা বলো, কুমারী মেয়েদের বাহবা কুড়োতে পারবে—"

হাসিটা চড়িয়ে দিল সুব্রত: "তুমি একদম সেকেলেই রয়ে গেলে—এখনকার কুমারী মেয়েরা পুরুষদের ঘৃণা করতে শিখেছে —জানো না।"

"তা বলে বিবাহিত পুরুষরা ত আর কুমারীপুজো ছাড়ে নি!"

"বিবাহিতা স্ত্রীরাও কি স্বামীকে সন্দেহ করা ছেড়েছে!"

স্ত্রী একপলক ক্রাইম-নভেলটার দিকে তাকিয়ে বললে: "তোমার সঙ্গে কথা বলবে কে? তোমার মনই ক্রিমিন্যাল!" বলেই চলে যাচ্ছিলেন, সুব্রত ডাকল: "শোনো—শোনো।"

চোখে অনিচ্ছা নিয়ে স্ত্রী ফিরে দাঁড়ালেন: "কী?"

"স্ত্রীরা মা না হলে স্বামীদের ক্রিমিন্যাল ভাবে।"

রাগে কি লজ্জায় স্ত্রী রাঙা হয়ে উঠলেন বোঝা গেল না— বিদ্যুতের মতো তিনি সুব্রতর চোখের উপর থেকে সরে গেলেন।

স্ত্রীকে বাজে কথার তোড়ে সরাতে পারলেও সুব্রত মন থেকে

সুপ্রিয়ার চিন্তাটাকে সরাতে পারল না। 'বিয়েটা বিশ্রী হলে দিদিভাই-এর মতো থাকলেই পারতে'—স্ত্রীর এ-কথাগুলোতে যে ইঙ্গিত আছে তা সুব্রতকে একটু বিমর্ষ করে তুলল। নিরঞ্জনকে সুপ্রিয়া বিয়ে করবে না অথচ ঘনিষ্ঠতা রাখবে তার সঙ্গে—এ-অবস্থাকে সুব্রতর মন কিছুতেই সমর্থন করতে পারছে না। কিন্তু এই হয়ত অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি এই অবস্থা হয়ে থাকে তাহলে সুব্রত সুপ্রিয়াকে খোলাখুলি বলবে: 'তুমি নিরঞ্জনকে বিয়ে কর।' সঙ্কোচ আর ভয়ের চাইতে পরিবারের সম্মান নিশ্চয়ই বেশি। পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করবার অধিকার সবারই আছে কিন্তু পরিবারকে অপমান করবার অধিকার কারো নেই।

সুব্রত উঠে দাঁড়াল। মা-র ঘরে এলো সে আবার। শাশুড়ীকে বৌমা কথামৃত পড়ে শোনাচ্ছেন। পড়া বন্ধ হল আবার সুব্রতর আবির্ভাবে।

"মা, তোমাকে আরেকটা কথা বলতে এলাম।"

"কী?" মা শুয়েই রইলেন, উঠে বসলেন না।

"তুমি সুপুকে বলো নিরঞ্জনকে সে বিয়ে করুক।"

ছেলের গাম্ভীর্যে মা বিপন্ন বোধ করলেন। বললেন, "আমি বলব?"

"তুমি যদি না বলো, আমাকেই বলতে হবে।"

"যা খুশি করো, আমার কিছু বলবার নেই।" মা করুণ শোনালেন।

"তোমার বলবার নেই মানে? তোমার ইচ্ছে নেই?"

"আমার ইচ্ছে থাকলেই কি ও বিয়ে করবে?"

"তোমার ইচ্ছে থাকলে নিরঞ্জনকে ও বিয়ে করবে না কেন?"

মা চুপ করে রইলেন।

"তোমার হয়ত ইচ্ছে নেই যে নিরঞ্জনকে ও বিয়ে করুক। কিন্তু নিরঞ্জনকে ওর বিয়ে না করা ভালো হবে না।" সুব্রত কথাটা বলে নাটকীয় ভঙ্গীতে ঘরে ফিরে এলো—শুনতে চাইল না, মা-র কিছু বলার আছে কি না।

ঘরে এসে নভেলটা হাতে নিয়ে শুয়ে পড়ল সুব্রত। এক পৃষ্ঠা পড়ে সে বুঝতে পারল, একটি বাক্যও তার মনে যায় নি। মনের উত্তেজনা কমাবার জন্যে সে ভাবল—সুপ্রিয়াকে এসব কথা আজ বলা যাবে না—অন্য একদিন বললেই হবে—কুন্তলার বিয়ের দিনেই বলা যেতে পারে!

গ্রীষ্মের ছুটির দিনগুলো পাছে ভারি হয়ে ওঠে কলেজের সময়টাতে তাই সুপ্রিয়া নিয়মিত কমার্শিয়াল আর ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে যাচ্ছে। পৃথিবীর দু'শো সত্তর কোটি মানুষের আহার্য উৎপাদনের পূর্ণ খবর সংগ্রহ করতে সে ব্যস্ত রাখছে নিজেকে। এ খবরের জগতে ডুবে থেকে আরাম পায় সুপ্রিয়া। সব ভাবনা চিন্তাকে দূরে ঠেলে দিতে পারে এ-সময়ে। মনে করতে পারে এ-সময়গুলো তাকে বিন্দু বিন্দু গড়ে তুলছে। সে যা হতে চায় তার উপাদান শুধু এখানেই আছে, আর কোথাও নয়।

কিন্তু সকাল-সন্ধ্যাগুলোতে তার অস্তিত্ব যেন পাল্টে যেতে থাকে। পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে, দেশের ভবিষ্যতের সঙ্গে তার যোগাযোগ যেন আলগা হয়ে পড়ে। মনে হয়, অত্যন্ত নিঃসঙ্গ সে, অসহায়। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার কোনো অবলম্বন নেই, কাজ নেই, এমন কি কোনো চিন্তাও যেন নেই। এমন হয়ে গেছে মন যে নিরঞ্জনকে মনে পড়ে একটা বই-এর মতন। যেন কতকগুলো কথার সমষ্টি: "রাষ্ট্রনীতিকে বাদ দিয়ে অর্থনীতির সড়কে চলতে পারবে না সুপ্রিয়া।" "সাম্যবাদী রাষ্ট্রের মার্কেট ইকনমি কি এনার্কো-সিন্ডিক্যালিজ্‌ম্? রাষ্ট্র থাকবে না তারপর? আমি ত ভাবতে পারি নে এখনই সেদিন এসে গেছে।" "যে গণতন্ত্রে জাতীয় আয়ের বেশির ভাগ চাষীমজুরের হাতে চলে যায় সে গণতন্ত্রের ভিত বড়ো শক্ত—তা জানো? সেখানে সাম্যবাদ

দুগ্পোষ্যই থাকবে।”...কথার ঢেউ মনের উপর দিয়ে চলে যায়—কথা শুধু ভাবায়, কথা বলার আর কথা শোনার মানুষগুলো আড়ালে পড়ে থাকে।

সেদিন সকালে খবরের কাগজে ‘ইকনমিক ওভারহল ইন সোভিয়েট রাশিয়া’ প্রবন্ধটি পড়তে পড়তে সুপ্রিয়ার মনে পড়ল নিরঞ্জনকে। মনে পড়ল, নিরঞ্জনের সঙ্গে অনেকদিন দেখা নেই। সেও খোঁজ নিতে যায় না আর নিরঞ্জনও কি খোঁজ নিতে আসবে! যদি আসত অনেকক্ষণ আলাপ করা যেতো প্রবন্ধের বিষয় নিয়ে। লেনিনের দিন থেকে আজকের দিন পর্যন্ত কি কি হয়েছে রাশিয়ায়—চোখ বুজে বলে যেতে পারত নিরঞ্জন—জানতে পারত সুপ্রিয়া অনেক কিছু, যা সে তেমন জানতে চায় নি। হয়ত বই পড়ে সবই জানা যায় কিন্তু নিরঞ্জনের মুখ থেকে জানার যেন একটা আনন্দ ছিল।

সে-আনন্দ কী! মানুষটাকে শ্রদ্ধা করতে পারার আনন্দ? অধ্যাপিকা সুপ্রিয়া তার চাইতে আর বেশি কিছু ভাবতে চাইল না।

রাসু একটা খাম নিয়ে ঘরে ঢুকল। কার চিঠি? তার নামেই চিঠি, দিয়ে চলে গেল রাসু। নিরঞ্জনের হাতের লেখা —স্পষ্ট চিনতে পারল সুপ্রিয়া। আশ্চর্য, সে নিরঞ্জনকে ভাবছিল আর তার চিঠি এলো ঠিক এম্নি সময়ে! ক্ষিপ্র হাতে খামটা ছিঁড়ে চিঠিটা বার করল সুপ্রিয়া। কয়েকটি মাত্র লাইন: “আমার জ্বর। তুমি যদি সময় করে একবার আসতে পারো বড়ো ভালো হয়!’ জ্বর? ইনফ্লুয়েঞ্জা? চিঠিটা আবার পড়ল সুপ্রিয়া। জ্বর। কি রকম জ্বর লেখা নেই। খবরের কাগজে ইনফ্লুয়েঞ্জা এপিডেমিকের খবর আছে—মনে পড়ল সুপ্রিয়ার।

শাড়ি পাল্টে, আয়নায় দাঁড়িয়ে চুলে কয়েকটা কাঁটা গ‍ুঁজে নিতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। আয়নায় নিজের উদ্বিগ্ন মুখও দেখতে পেলো সে। ব্যাগে টাকা আছে কি না দেখে উদ্বিগ্ন মুখেই সে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। ভাবলে না, বৌদি তার মুখ দেখে ফেলতে পারেন।

বৌদির সঙ্গে দেখা হল না। মা তাঁর ঘরে, দেখা হবার কথা নয়। কারো কাছে কিছু বলে যাবারও দরকার বোধ করল না সুপ্রিয়া। একবার জিতেন ডাক্তারের কথা মনে পড়ল। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাবে? না থাক। বাড়ির ডাক্তার বাড়ির লোকেরই সামিল।

রাস্তা দিয়ে খানিকটা হেঁটে ট্যাক্সি পাওয়া গেল। ট্যাক্সি নিলে সুপ্রিয়া।

ট্যাক্সিতে বসে ভাবছে সে, কতোদিন জ্বর? তা-ও চিঠিতে নেই। যদি টাইফয়েড হয়? চিঠি পোস্ট করলে কে? নিরঞ্জন নিজে? জ্বর নিয়ে বেরিয়েছিল? কোনো প্রশ্নেরই উত্তর সে জানে না, কিন্তু প্রশ্ন করতে থাকল মন।

ল্যান্সডাউন দিয়ে ট্যাক্সি চলেছে। অনেকদিন এ-রাস্তায় আসে নি। বাইরে তাকিয়ে প্রশ্নগুলো ভুলতে চাইল সে। এমন যদি হয় যে নিরঞ্জন ফাঁকি দিয়েছে, জ্বর-টর কিছুই হয় নি, সুপ্রিয়াকে ডেকে নেবার জন্যেই এ ফাঁকি! ভাবতে গিয়েও সে ভাবতে পারল না। নিরঞ্জনকে ছেলেমানুষ ভাবা যায় না।

সকালের হাওয়া এখনও তেতে ওঠে নি। সুপ্রিয়ার কপালে ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা লাগছিল। নিরঞ্জনের ঘরে ত ফ্যান নেই। মাথায় হাওয়া লাগা নিশ্চয়ই দরকার। হাওয়ার কী ব্যবস্থা করা

যায়? দুপুরে ঘরটা বেশ গরম—ফ্যান ছাড়া থাকা চলে না সেখানে। ফ্যান ভাড়ায় নিরঞ্জনের আপত্তি হবে। দরকারের বেশি একটি পয়সা সে খরচ করে না আর দরকারও তার খুব কম। এখন যে ফ্যানের দরকার তাও সে মানতে চাইবে না। তাহলে সুপ্রিয়াকেও বা তার কিসের দরকার— নিরঞ্জনকেই যেন প্রশ্ন করল সুপ্রিয়া।

সার্কুলার রোডে এসে পড়েছে ট্যাক্সি। আমি কি না এসে থাকতে পারতাম না—সুপ্রিয়া নিজেকে জিজ্ঞেস করল। না আসার কথা ত একবারও ভাবে নি সুপ্রিয়া। চিঠি পেয়ে আসার কথা ভাবা ছাড়া যেন আর কোনো কাজই ছিল না তার। সুপ্রিয়া নিজের দুর্বলতায় অবাক হল। কিন্তু অবাক হয়েও তর্ক করতে ছাড়ল না মন। এ কি দুর্বলতা? কুন্তলার অসুখের খবর পেলেও ত যেতো সে। যেতো, কিন্তু ট্যাক্সিতে নয়।

পার্ক স্ট্রীট পার হয়ে যাচ্ছে ট্যাক্সি। সুপ্রিয়া খুঁড়ে খুঁড়ে নিজের চেহারাটাকে আর দেখতে চাইল না। রোগীর শয্যায় নিরঞ্জনের অসহায় মুখ কল্পনা করছে। সে সুস্থ, নিরঞ্জন অসুস্থ। অসুস্থের প্রতি তার কর্তব্য আছে। নার্সের কর্তব্য।

প্রায় নিঃশব্দে সুপ্রিয়া এসে ঘরে ঢুকল। দরজা খোলাই ছিল তবে ভেজানো। যতোটুকু আলো ঢুকল দরজার ফাঁকে তাতেই চোখ মেলে তাকাল নিরঞ্জন। ঠোঁটে একটু হাসির আভাস এনে বললে: "তোমাকে জ্বালাতন করলাম। ভেবে দেখলাম আর কাকে জ্বালাতন করা যায়! তোমার নাম ছাড়া কারো নাম মনে পড়ল না।"

সুপ্রিয়া বিছানার কাছে এগিয়ে এলো যেন কোনো কথা শুনবার তার দরকার নেই, বললে, "কবে থেকে জ্বর?"

"কাল থেকে। কিন্তু কাছে এগিয়ো না—হয়ত ইনফ্লুয়েঞ্জা।"

"ডাক্তার দেখেছেন?" সুপ্রিয়া নড়ল না।

"না।"

"এখন জ্বর কতো?"

"কী জানি। থার্মোমিটার ত নেই।"

সুপ্রিয়া নিরঞ্জনের কপালে হাত দিল। নিরঞ্জন হাতটা সরিয়ে দিল নিজের তপ্ত হাত দিয়ে: "করছ কী? ভীষণ ছোঁয়াচে ইনফ্লুয়েঞ্জা। মালয়-সিঙ্গাপুরের কি না কে জানে?"

"কিন্তু জানা ত দরকার। এদিকে ডাক্তার কোথায় পাওয়া যাবে?"

"বৌবাজার।" নিরঞ্জন স্যুটকেশের দিকে হাত বাড়িয়ে বললে: "ওখানে স্যুটকেশে টাকা আছে। ডাক্তার হয়ত দরকার।"

"দেখছি।" সুপ্রিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নিরঞ্জন সুপ্রিয়ার মুখে আশঙ্কা বা আতঙ্ক কিছুই দেখতে পেলো না। কেমন যেন একটু কঠিন মুখ। ডাক্তার ডাকা উচিত কি অনুচিত সে আলাপও সে করতে পারে নি সুপ্রিয়ার সঙ্গে। কিন্তু এ-আলাপের জন্যেই সে সুপ্রিয়াকে ডেকেছিল। ডাক্তার যদি তাকে বেলিয়াঘাটা হাসপাতালে যেতে বলেন? যেতে অবশ্যি তার আপত্তি নেই কিন্তু এ-ঘরের কী উপায় হবে? সুপ্রিয়ার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলবে ভেবেছিল নিরঞ্জন। ভেবেছিল, ডাক্তার না ডাকাই হয়ত স্থির হবে শেষে।

আমার যা জীবন, অসুস্থ হলে হাসপাতাল ছাড়া কোথায়

আমার ঠাঁই—ভাবল নিরঞ্জন। কিন্তু খুব সহজভাবে ভাবতে পারল না। একটা শূন্যতার ব্যথা কোথায় যেন নড়ে উঠছে। নিঃসঙ্গতার কঠিন হাত অনুভব করল সে মনের উপর।

সুপ্রিয়ার কাছে বুঝি সে নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি চেয়েছিল। কিন্তু ও তা দেবে না। যে কাজ নির্মলও করতে পারত সুপ্রিয়া তাই করছে। আর এও ত ঠিক যে নির্মল আজ কলকাতায় নেই বলেই সুপ্রিয়াকে ডেকেছে নিরঞ্জন। নির্মল কলকাতায় থাকলে সুপ্রিয়ার প্রয়োজন হয়ত সে দূরে ঠেলেই রাখত। তাহলে এ-চাওয়ার কী মানে হয় আজ? কিন্তু অসুস্থ দেহ মনের তর্ক শুনতে চায় না, মনও অনেকক্ষণ যুক্তি ধরে থাকতে পারে না অসুস্থ দেহে।

শরীরের গ্লানিতে চোখ বুঁজে রইল নিরঞ্জন।

হয়ত তন্দ্রায়ই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল সে, যখন ঘরে শব্দ শুনে চোখ মেলে তাকাল।

সুপ্রিয়া বিছানার পাশে চেয়ার টেনে দিচ্ছিল, ডাক্তার প্রফুল্ল মুখে এসে বসলেন। রোগীর জিভ, গলা, বুক, পেট যথারীতি পরীক্ষা করে ডাক্তার জানতে চাইলেন নিরঞ্জন বহিরাগত কিনা। তা যখন নয়, জ্বরের তাপ নিতে নিতে ডাক্তার জানালেন, ভয় পাবার মতো কিছু নেই। তবু সাবধান থাকতে হবে—বিশেষ করে সুপ্রিয়াকে। রুমালে ফরমেলিন ব্যবহার করা ভালো। সাবান ঘসে হাত ধুয়ে এসে ডাক্তার প্রেসক্রিপসন লিখে সুপ্রিয়ার হাতে দিলেন। পথ্যের তালিকা শুনিয়ে বিদায় নিলেন। ডাক্তারের সঙ্গে বাইরে গেল সুপ্রিয়া, কিন্তু, নিরঞ্জন লক্ষ্য করল, স্যুটকেশ থেকে টাকা সে নেয় নি। মুখে তার যন্ত্রণা ফুটে উঠছে।

সুপ্রিয়া ফিরে এসে বললে: "ওষুধগুলো আমি নিয়ে আসছি—আপনি ত চুপচাপ বেশ ঘুমুতে পারেন, ঘুমিয়ে থাকুন।"

"টাকা নিলে না?" নিরঞ্জন উঠে বসল।

"নেবো।" ঠাণ্ডা গলায় বললে সুপ্রিয়া।

"একটা খামে তোমার টাকাটাও আছে—নিয়ে যেও।"

সুপ্রিয়া সুটকেশের ডালা খুলে উপরেই টাকা আর খাম দেখতে পেল। একটা নোট আর খামটা হাতে নিয়ে সে ভাবল, অসুস্থ লোকের মনের বিরুদ্ধে সে যাবে না। তাই আর একটি কথাও না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ট্যাপ খুলে নিরঞ্জন মাথা ধুচ্ছিল। দুই হাত ভর্তি সওদা নিয়ে ফিরে এসে সুপ্রিয়া তা দেখল, কিছু বললে না। বার্লি, নুন, ঠোঙাভর্তি কমলালেবু-মোসম্বি, রস নিংড়াবার কাচের বাসন আর ফলকাটা ছুরী এক-এক করে স্টোভের পাশে সাজিয়ে রেখে অষুধের শিশিটা আর একটা পেয়ালা এনে টেবিলের উপর রাখলে সে। বললে, "মাথা ধুয়ে এক ডোজ অষুধ খেয়ে নিন। আমি গরম জল করে দিচ্ছি গারগ্ল্ করে নেবেন পরে।"

সুপ্রিয়া স্টোভ ধরাতে ব্যস্ত হল। নিরঞ্জন টেবিলে এসে অবুধ খেয়ে বিছানায় চলে যাচ্ছে আবার।

"ডাক্তার কাল এম্নি সময়ে আবার আসবেন।" সুপ্রিয়া বললে।

"কেন?" নিরঞ্জন ভাবছিল, ডাক্তার ডাকার মতো অসুখ তার নয়।

"যাতে আপনাকে হাসপাতালে যেতে না হয়।" হাসিমুখ সুপ্রিয়ার।

"তোমার হয়রানি দেখে কিন্তু আমার হাসপাতালেই যেতে ইচ্ছে করছে।"

"একা-একা থাকবেন, অসুখ-বিসুখে মানুষকে হয়রানি করাবেনই ত!"

"একা থাকার যন্ত্রণা তা-ই।" নিরঞ্জন শুয়ে পড়ল।

"শোবেন না। গারগ্‌ল্‌ করে নিন—তারপর বার্লিটা করে দিচ্ছি।"

দুটো হাত কপালে রেখে নিরঞ্জন বলতে লাগল: "এসব ছোট-খাট অসুখ যে কেন হয়—একটা বড়ো অসুখে আপদ চুকে গেলেই বাঁচতাম।"

সুপ্রিয়া প্যানে জল বসাচ্ছে, কথা বলল না।

একটু চুপ থেকে নিরঞ্জনই আবার বললে: "জানো সুপ্রিয়া, রেবার মা মারা গেছেন।"

"মারা গেছেন?" সুপ্রিয়া চমকে উঠল।

"মারা যাওয়াই ত ভালো।" 'When one has passed his thirtieth year, one then is just the same as dead'।"

সুপ্রিয়া নুনজল নিয়ে এলো। নিরঞ্জন গ্লাসটা হাতে নিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে। সুপ্রিয়া ভারি গলায় জিজ্ঞেস করলে: "রেবার ঠিকানাটা কী?"

কলোনীর নাম জানাল নিরঞ্জন। সুপ্রিয়া বার্লি করতে এসে রেবাকে ভাবতে লাগল। এমন ত তারও হতে পারে যেদিন মা দাদা থাকবেন না। ভয়ে যেন আড়ষ্ট হয়ে এলো তার

শরীর। বাবার মৃত্যুর পর যেম্নি ভয় করত, তেম্নি একটা ভয় নিয়ে সে বসে রইল খানিকটা সময়। তারপর দেখতে পেলে স্টোভে জল ফুটছে। তাড়াতাড়ি বার্লি গুলে ঢেলে দিলে জলে।

নিরঞ্জন সুপ্রিয়ার সামনে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে বললে: "রেবার জন্যে এদিকে একটা হস্টেল দেখতে পারো?"

"এদিকে আসবে রেবা?" বার্লিটা দেখছিল সুপ্রিয়া।

"চাকরি আর হস্টেল পেলে না আসবে কেন?" নিরঞ্জন বিছানায় চলে গেল।

"দেখব।"

নিরঞ্জন বিছানায় শুয়ে বলছে: "অসুখটা নিয়ে কাল বেশ মৃত্যুর চিন্তায় ছিলাম—আজ তোমার এসব কাজ দেখে দেখে বাঁচার লোভে পড়ে যাচ্ছি।"

সুপ্রিয়া অন্য কথায় মন দিলে: "দুপুরে ত এখানে খুব গরম —একটা ফ্যান ভাড়া নেওয়া যায় না?"

নিরঞ্জনের ইচ্ছা করল উঠে গিয়ে স্টোভটা নিভিয়ে দেয় কিন্তু তা না করে বললে: "অসুখের সময়কার সৌখীনতা অসুখ সেরে গেলেও হয়ত যেতে চাইবে না—ফ্যানের হাওয়া আমার দরকার নেই।"

"আপনার দরকার আপনিই ভালো বুঝবেন।" সুপ্রিয়া বার্লিতে একমনে চামচে চালাতে লাগল।

নিরঞ্জন থামল না: "খাওয়ার ভাত, পরার কাপড়, ঘুমোবার ঠাঁইএর ভাড়া যোগাড় করাই যাদের জীবন, আমি সেই কোটি কোটি লোকেরই একজন—এ-কথা ভুলে যাওয়াই ত বিলাসিতা।"

"বেশ, ভুলবেন না।" সুপ্রিয়া একটু হাসল: "আর রাখবেন দুর্বল শরীরে আপনি বেশি কথা বলছেন।"

চারদিন ভুগতে হল নিরঞ্জনকে, তার বেশি আর কিছু নয়। সুপ্রিয়াকেও পড়া থেকে ছুটি নিয়ে তিনদিন রোগীর পথ্য তৈরী করতে হয়েছে আর রোজই ভাবতে হল তার যেন একটা বড় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। রেবাকে সে চিঠি দিলে তার সঙ্গে বাড়িতে দেখা করতে—যাদবপুরের রাস্তাঘাট তার জানা নেই বলে সে যেতে পারল না—রেবার সঙ্গে জরুরী কথা আছে সুপ্রিয়ার। চিঠিটা নিজ হাতে ডাকে দিয়ে নিরঞ্জনের সঙ্গে সে দেখা করতে গেল। আজ নিরঞ্জন হোটেলেই মাছের ঝোল ভাত খাবে। কাল একটু স্টু তৈরী করে দিয়েছিল সুপ্রিয়া, আজও দিতে চেয়েছিল কিন্তু নিরঞ্জন নাকি সুস্থ হয়ে গেছে শুনতে হল সুপ্রিয়াকে। সেকেন্ডারী ইনফেকশনের ভয়ও কি নেই তার? না—ভয় নেই বরং সে তা কামনা করে কারণ তার জীবন দাবী করবার ক্ষমতা আছে।

সুপ্রিয়া বাধা না দিয়ে শুনে গেছে এই তিন দিন এমন সব কথা।

অসুখে মানুষের চরিত্র বদলে যায়, না আসল চরিত্রটা ধরা দেয় —ট্রামে বসে ভাবছিল সুপ্রিয়া। কিছুতেই সে নিরঞ্জনকে আর একটা বই-এর মতো ভাবতে পারছে না। তাকে মনে হচ্ছে যেন একটা উপন্যাসের নায়ক, যে জীবনের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে মৃত্যুকে ভাবে মনোরম। মৃত্যুর প্রেমে-পড়া শেলী! সাহিত্য পড়লেই কবি হয়ে ওঠে মানুষ! কাল সে বলছিল: "জীবন আমাকে

কিছু দিতে পারে না জেনেই আমাকে বাঁচতে হবে—এ বাঁচার কী মানে হয়?"

"কেন, জার্নালিস্ট ত কতো বিচিত্র জীবনের ভেতরে যায়—তার আনন্দ নেই?" সুপ্রিয়া উৎসাহিত করতে চেয়েছিল নিরঞ্জনকে।

"বিচিত্র জীবন দেখতে হলেও টাকা চাই।"

"সাহস থাকলে হয়ত টাকার অভাব দূর হয়ে যায়।"

"সাহস ভুলে গেছি।"

"কেন?"

"আমার বয়েসে সাহস মানায় না—যে বয়েসে মানায়, সে বয়েসে সাহস ছিল।"

"বয়েসের দোহাই কারা দেয় জানেন?"

"যারা বিগত-যৌবন।"

"না, যারা অলস।"

"আলস্য বয়েসেরই সঙ্গী।" বলেই নিরঞ্জন হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠেছিল: "তাছাড়া কোথায় আমার কাজ? কে আমাকে কাজ দেবে? আজকের সমাজে আমাদের মতো মানুষদের কাজ আছে কিছু?"

অভিমান। স্বাধীনতার আগেকার দিনের কর্মীদের অভিমানে ভরা বাংলাদেশ! নিরঞ্জনের মুখে ছবিটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল সুপ্রিয়া। রেবার দাদার মুখে এ-ছবি হয়ত আরো ভীষণ ছিল। সে যে কেমন কোনোদিন জানবে না সুপ্রিয়া। কিন্তু না জানলেও নিরঞ্জনকে দেখে বুঝতে পারে খানিকটা।

বুঝতে পারলেও সুপ্রিয়ার মনে হয়, এরা যেন অন্য এক

জীবনের মানুষ—এখনকার জীবনের সত্যি কেউ নয়। নিজের জীবনের অনুভব দিয়ে সুপ্রিয়া এদের জীবন ছুঁয়ে যেতে পারে না। সে জানে তার জীবন অজস্র সম্ভাবনায় ভরা আর এরা যেন দেউলে হয়ে গেছে। যে দারিদ্র্যকে একদিন এরা ভয় করে নি, সে-দারিদ্র্যই আজ এদের শক্তি কেড়ে নিয়েছে। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়বার সাহসটুকু পর্যন্ত নেই! 'আমি দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়তে চাই—' মনে মনে বললে সুপ্রিয়া: 'এই আমার সব চেয়ে প্রিয় কথা।'

"তোমাকে তোমার কাজ করবার সুযোগ কে দেবে?" নিরঞ্জন একদিন বলেছিল।

"আমি নিজেকে তৈরী করব যাতে সুযোগ আসে।"

সুপ্রিয়ার কথায় নিরঞ্জন হেসে উঠেছিল। যে-পুরুষ বিশ্বাস করতে চায় না ঘরের বাইরে মেয়েদের কাজ করবার ক্ষমতা আছে, নিরঞ্জনের ভেতর সে-পুরুষই হয়ত তখন যুক্তি ছেড়ে হাসির আড়াল নিয়েছিল। তাছাড়া যা হতে পারে তা হল সব ব্যাপারে তার গভীর অবিশ্বাস। রাষ্ট্রনীতির শিক্ষায় অবিশ্বাসে মন বসে গেছে। কারো জীবনে কোনো সফলতা আসবে বলে ভাবতে পারে না। তার ভাবনা নিয়ে থাকুক সে, সুপ্রিয়ার তাতে কি?

এসপ্ল্যানেডে ট্রাম বদল করল সুপ্রিয়া। পাঁচটা—হাত-ঘড়িতে দেখল। হঠাৎ মনে হল তার নিরঞ্জন ত বেরিয়েও যেতে পারে। হয়ত টিউশানিতেই যাবে বা পত্রিকার অফিসে। তাহলে আবার আসতে হবে কাল। আজ সারাদিন সে ভেবেছে, রেবার জন্যে নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। নইলে তার আসার

দরকার ছিল না। নিরঞ্জনের অসুখের জন্যে যে আসার দরকার হয়েছিল তার জন্যে সে নিজেকেই দায়ী করছে এখন। যেন নিজের কাছে নিজেই দোষী। সমস্ত শরীর সতর্কতায় কঠিন হয়ে এলো তার।

কাগজের শিলপ থেকে মুখ তুলে নিরঞ্জন বললে: "এসো। আজ আসবে ভাবি নি।"

খালি চেয়ারটাতে চুপচাপ এসে সুপ্রিয়া জিজ্ঞেস করল: "কি লিখছিলেন?"

"বাঙালীর ভবিষ্যৎ।"

"কি দেখতে পেলেন—অন্ধকার—না?"

"তা কেন?" হাসল নিরঞ্জন: "অনেক আলোর বিন্দু আছে।"

"অন্ধকার ছাড়া যে আর কিছু দেখতে পাচ্ছেন—খুব ভালো কথা।"

"শরীর সুস্থ থাকলে আকাশে তাকানো যায়।" কাগজ-গুলো গুছিয়ে রেখে নিরঞ্জন সুপ্রিয়ার মুখোমুখি বসল।

মুখে হাসির আলো ফুটিয়ে তুলে সুপ্রিয়া বললে: "আকাশে ত আর বাঙালীর ভবিষ্যৎ ঝুলছে না।"

"নিশ্চয়।" নিরঞ্জনও হাসল: "বৃষ্টি না হলে উপায় আছে বাঙালীর?"

সুপ্রিয়া হেঁয়ালিতে আটকে থাকতে চাইল না, বললে: "বাঙালীর উপায় বাঙালী দেখবে—হোটেলে কী খেয়েছেন আজ?"

"ঝোল-ভাত। মুখ তেতো হয়ে আছে—ভালো লাগছিল না খেতে।"

"কিন্তু বলছিলেন ত শরীর আপনার সুস্থ।"

"বেশিদিন অসুস্থ থাকা পোষায় না।"

"আমি ভাবছি কি জানেন? আপনার একা থাকাটা পোষাচ্ছে না।" আলোটা মুখে ঠিক ধরা আছে সুপ্রিয়ার।

"আমিও ভাবছি কোনো মেসে চলে যাব।"

সুপ্রিয়া একথা শুনতে চায় নি, ভেবেছিল নিরঞ্জন তাকে প্রশ্ন করবে, কেন? তাই প্রশ্নটা আদায় করবার জন্যে বললে: "মেসে থাকা-ও ত একরকম একাই থাকা—আমি তা বলছি নে।"

"মেসে ছাড়া আর কি ব্যবস্থা হতে পারে?"

আর ইতস্তত নয়, সুপ্রিয়া বললে: "আপনি বিয়ে করুন। রেবাকেই ত বিয়ে করতে পারেন।"

অন্য কেউ এ-কথা বললে সঙ্গে-সঙ্গেই হেসে উঠত নিরঞ্জন। কিন্তু এখন চুপ করে থেকে হাসির মুহূর্তটা পার করে দিল সে। তারপর যেন আলগাভাবে একটা কথা তার মুখ থেকে খসে পড়ল: "রেবাকে বিয়ে করব মানে?"

"আপনার বিয়ে করা উচিত। আর রেবাকেই বিয়ে করা উচিত।"

"এ উচিতগুলো তোমার মনে হচ্ছে কেন?" নিরঞ্জন কঠিন হতে পারল।

"আপনি একলা থাকতে পারবেন না বলে।" সহজভাবে বললে সুপ্রিয়া।

নিরঞ্জন চেয়ার ছেড়ে বিছানায় গিয়ে বসল: "গত কুড়ি

বছর আমি যদি একা থাকতে পেরে থাকি, তাহলে আর কুড়ি বছরও একা থাকতে পারব।"

"না, পারবেন না।" সুপ্রিয়ার গলা একটু শক্ত শোনাল।

আহত হল নিরঞ্জন। এ-আঘাত সুপ্রিয়াই তাকে দিতে পারে। ফিরে সুপ্রিয়াকেও আঘাত দেওয়া যায় কিন্তু ভাবল সে, কি লাভ আঘাত দিয়ে? তাই সে বিষণ্ণ গলায় বললে: "তুমি যদি আমায় চিনে থাকো, সুপ্রিয়া, আমিও তোমাকে চিনেছি।"

"আমাকে যদি চিনে থাকেন, আমি খুশি হব।"

"কিন্তু তুমি আমাকে যে-ভাবে চিনলে তাতে আমি খুশি হতে পারলাম না।"

"আপনাকে আমি খুব বেশি চিনেছি বলেই বলছি, আপনি সুখী হতে চেষ্টা করুন।"

সুখী হতে কি চেষ্টা করে নি নিরঞ্জন? সুপ্রিয়ার সঙ্গে এই একবছর পরিচয়ের পর কি সুখী ছিল না সে? কিন্তু সুপ্রিয়াকে সে-কথা বলার আজ যেন আর কোনো মানে নেই। শুধু সে বললে: "নিজেকে নিয়ে আমি দুঃখিত নই।"

"বেশ।" সুপ্রিয়া শান্ত হয়ে এলো: "অপরকে সুখী করবার দায়ও ত আপনার আছে।"

নিরঞ্জন অসহিষ্ণু হল: "তোমাকে সুখী করতে আমি রেবাকে বিয়ে করব?"

"রেবাকে সুখী করতেই রেবাকে বিয়ে করবেন।" ম্লান-ভাবে হাসল সুপ্রিয়া।

"আমি অবাক হচ্ছি সুপ্রিয়া, কি করে এসব কথা তুমি

বলতে পারো!"

"কেন পারব না? আমি চাই, রেবা সুখী হোক।"

"তুমি নিজে সুখী আছো বলে সবার সুখ চাও, তা-ই না?" ঝাঁঝাল শোনাল নিরঞ্জনকে।

"তা যদি হয় তাহলে তা এমন কি অপরাধ?"

"না। অপরাধী কেউ তোমাকে বলবে না।"

সুপ্রিয়ার মুখে ছায়া পড়ল। কিন্তু সে বলতে পারল: "আমার যা অপরাধ তা আমি নিজের কাছে স্বীকার করি।"

"আর আমার যা অপরাধ তার জন্যে তুমি শাস্তি দিতে এসেছ?"

"অপরাধ আমি ভুলে যেতেই চাই, আপনাকেও ভুলিয়ে দিতে চাই।"

"আমাকে ভুলিয়ে দিতে হবে না, আমি নিজেই ভুলে যেতে পারব।"

"কিন্তু আমি যখন প্রধান অপরাধী, আমি ত তাতে সান্ত্বনা পাব না।"

"আমাকে ক্ষমা কর—তোমাকে আমি সান্ত্বনা দিতে পারব না।"

এখানেই যদি আজ নিরঞ্জনকে রেখে সুপ্রিয়া চলে যায় তাহলে কি সে ভুলতে পারবে নিরঞ্জনকে? কিন্তু যেখানেই নিরঞ্জন থাক, তাকে ভুলতেই হবে। সুপ্রিয়ার মুক্তি চাই। সে মুক্তি যদি সহজ না হয়, কি ক্ষতি? বন্ধন যদি খসে না পড়ে তাকে কেটে ফেলতে দুঃখ কি? কিন্তু এ-বন্ধন ত সে চেয়েছিল একদিন! চেয়েছিল। সেদিন সে ভাবে নি, এ-বন্ধন

তাকে পেছনে টানতে থাকবে। নিরঞ্জন তাকে পেছনে টানছে। সে-কথা সে নিরঞ্জনকে শোনাতে চায় না বলেই অনেক কথা বলতে হচ্ছে আজ।

"আপনার কাজ আপনিই ভালো জানেন। আমি পরিচি-তের অধিকার নিয়েই আপনাকে অনুরোধ করতে এসেছিলাম।" বিচলিত না হয়ে বলতে পারল সুপ্রিয়া।

"পরিচয়ের নিবিড়তা যখন অপরাধ বলে মনে হয় তখন আর পরিচয়ের কি মানে থাকে?"—নিরঞ্জন আপন মনেই বলে গেল।

তারপর আর কথা চলে না। কিন্তু সুপ্রিয়া অভিমান দেখাতে আসে নি, এসেছে নিজেকে মুক্ত করে নিতে। তাই সে বললে: "একদিন হয়ত পরিচয়ের মানে থাকবে না, কিন্তু আমার অনু-রোধের মানে থাকবে।"

সুপ্রিয়াকে অসহ্য লাগছিল নিরঞ্জনের। সুপ্রিয়া যদি না আসত—আর কোনোদিনই না আসত—চিঠি দিয়েও না আনতে পারত তাকে, তা-ও যেন ভালো ছিল। কিন্তু এ আসা যেন দাঁড়িয়ে থেকে তার শাস্তি উপভোগ করতে আসা। এ নিষ্ঠুর-তার তুলনা নেই। সুপ্রিয়াকে সে সুদূর ভাবলেও নিষ্ঠুর ভাবতে পারে নি। যন্ত্রণায় ছটফট করে বলল নিরঞ্জন: "আমার ভবিষ্যৎ তোমার নখের দর্পণে থাকতে পারে ভেবে তুমি খুশি হয়ে যেতে পারো—আর কিছু আমার বলবার নেই।"

সুপ্রিয়া উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েও বললে সে: "কেউ কারো ভবিষ্যৎ জানে না, তবু ভবিষ্যৎ তৈরী করতে চায়। আমিও চাই, আপনিও চান। আমি যা চাই আমি জানি। ভেবেছিলাম,

আপনার চাওয়াটা আপনি জানেন না।”

নিরঞ্জন সুপ্রিয়ার মুখের দিকে তাকাল না আর। সুপ্রিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারল, তবু। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ মিলিয়ে গেলে সে দরজার দিকে মুখ ফেরাল। সুপ্রিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল তার মনে।

সুপ্রিয়ার সঙ্গে তার বয়েসের ব্যবধান, সময়ের ব্যবধান, জীবনের ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলেছে, ভেবেছিল নিরঞ্জন। তা যে কতো মিথ্যা খানিকটা সময় আগেও সে জানত না। জীবনে তার অনেক বন্ধুত্ব মিথ্যা হয়ে গেছে কিন্তু সত্য-ও ত হয়েছে অনেক বন্ধুত্ব। সুপ্রিয়া যে মিথ্যা হয়ে যাবে সে ভাবতে চাইত না। না চাওয়াটা শুধু কি তার দুর্বলতা?

সুপ্রিয়া যা চাইল তা কি নিজের দুর্বলতার গায়ে বর্ম পরানো নয়? মিথ্যা হয়ে যাবার স্বাভাবিক শক্তি তার নেই। তা যদি থাকত তাহলে নিরঞ্জন কোনোদিন তাকে সত্য ভাবত না—তাকে স্পর্শ করবার ইচ্ছা তার হত না। 'আমি ওর জীবনে না এলে ভালো করতাম'—এ যেমন নিরঞ্জনকে আজ ভাবতে হচ্ছে, হয়ত সুপ্রিয়াকেও ভাবতে হচ্ছে। মিথ্যা হয়ে যাবার গ্লানিতে ভাবতে হচ্ছে।

বাঁচুক সুপ্রিয়া তার ভবিষ্যতের লোভে। নিরঞ্জন নিজেকে সংযত করল। 'আমার ভবিষ্যৎ নেই'—বলল সে মনে-মনে। 'আমার কি অধিকার আছে অপরের ভবিষ্যতে ছায়া ফেলে দাঁড়াবার?'—জিজ্ঞাসা করল সে নিজেকে। সুপ্রিয়া তার কাছে অসঙ্কোচে এসেছিল কিন্তু সঙ্কোচ নিয়ে ফিরে গেল। হয়ত ভয় করে সে নিরঞ্জনকে, যার পুরুষ ছাড়া অন্য পরিচয় নেই

একটি মেয়ের কাছে। অন্য পরিচয় হয়ত থাকেও না।

নিরঞ্জন উঠল। চেয়ারে গেল আবার। কাগজের শ্লিপ-গুলো টেনে নিল। দু'শ্লিপ লেখা হয়েছে। পড়ল লেখাটা। যার নিজের ভবিষ্যৎ জানা নেই সে তার জাতির ভবিষ্যৎ কি জানে? শ্লিপ দু'টো সে ছিঁড়তে লাগল টুকরোর পর টুকরো করে। 'যারা বাঙলার ভবিষ্যৎ গড়বে তাদের মনের শরিক আমি নই—' বলল সে নিজেকে শোনাতে। তারপর মনে হল তার, সে পঙ্গু!"

শাড়িটা সুপ্রিয়ার কোলের উপর ফেলে দিয়ে বৌদি বললে: "দ্যাখো কেমন হয়েছে!"

পাড়ে হাত বুলিয়ে সুপ্রিয়া জিজ্ঞেস করল: "কতো দাম?"

"তুমিই বলো না!"

"এমন শাড়ি চোখেই দেখি নি, আমি কি বলব?"

"কুন্তলার পছন্দ হবে ত?"

"কনের পছন্দে কি কেউ শাড়ি দেয়—তোমার পছন্দে তুমি দেবে—হয়ত খরচের পছন্দটা দেখবে বিয়ে-বাড়ি।"

"তিনজন যাচ্ছি একখানা মাত্র শাড়ি নিয়ে—তা-ও তুমি খরচ না করতে বলো?"

"আমি যে যাব তা-ই ঢের—শাড়ি দেয়ার ব্যাপারে আমি নেই।" সুপ্রিয়া শাড়িটা বৌদির হাতে তুলে দিলে।

"আমরা কে বাবা—তোমারই ত বন্ধু—খালি হাতেও আমরা যেতে পারি।"

"এ গরিবানা দেখাতে সাহস চাই—তোমাদের সে সাহস আছে নাকি!"

"তোমার ত আছে!" বৌদি হাসলেন: "আমরা দেখছি আর ধন্যি ধন্যি করছি।"

সুপ্রিয়াকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই চলে গেলেন বৌদি। সুপ্রিয়া ভেবে দেখল, হয়ত এ-কথার পিঠে কোনো কথা সে বলতেও পারত না। বৌদির কথায় বাড়ির আবহাওয়ার

খবর পাওয়া যায়। তাকে নিয়ে চঞ্চল হয়েছে বাড়ির আব-হাওয়া—সে জানে। আর এ-ও জানে, এ-চঞ্চলতার কোনো মানে নেই।

সুপ্রিয়া পড়ায় মন দিতে চাইল। কিন্তু বই-এর একটা পৃষ্ঠা না উল্টোতেই সুব্রত এসে ঘরে ঢুকল।

"আজ বুঝি তোমাদের কুন্তলার বিয়ে?" খুশি-খুশি চোখে তাকাল সুব্রত সুপ্রিয়ার মুখে।

"হ্যাঁ।" বইটা সরিয়ে রাখল সুপ্রিয়া।

"খুব ভালো বিয়ে হচ্ছে শুনলাম।"

"কুন্তলাও ত ভালো মেয়ে।" সুপ্রিয়া হাসল।

"আমরা ভাবছি তুমিও যদি বিয়ে করতে, বেশ হত।" সুব্রতও হাসতে লাগল।

"আমি যে পাসপোর্টের জন্যে এপ্লাই করে দিচ্ছি!"

"ও তা-ই নাকি? সে ত খুব ভালো—আমিও ভাবছিলাম তোমাকে বলব, মাস্টারিতে জীবন নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।"

"তোমাকে মা বলেন নি?"

"না ত। মা রাজি হয়েছেন?"

"মা ত বলেন, বিদেশ গিয়ে কি আর পড়াশুনো হবে—কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বসে পড়াশুনো কর!"

"অবশ্য পড়াশুনোর সুযোগ এখানেও যথেষ্ট আছে—"

"আমি ত পড়াশুনো করতে যাব না—ওদের ইকনমির চেহারাটা দেখতে যাব।"

"তা ঠিক হবে না—লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সের দাম

আছে।”

“দেখা যাক।” সুপ্রিয়া সুব্রতকে আর ধরে রাখতে চাইল না।

গালে হাত ঘসে সুব্রত নিস্তেজ হয়ে চলে গেল।

দাদার মুখে বিয়ের কথা শুনে অবাক হয় নি সুপ্রিয়া। বাড়িতে এ-কথা হওয়া স্বাভাবিক। শুধু কুন্তলা বিয়ে করছে বলেই নয়, নিরঞ্জনকে জেনেছে বলে। নিরঞ্জনের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কী বিয়ে ছাড়া অন্য পথে যেতে পারত না? নিজেকে খুঁজতে চাইল সুপ্রিয়া। তার ভয় হয়েছে পাছে নিরঞ্জন এক-দিন এ-দাবী জানিয়ে বসে। নিজেকে তখনও অবশ্য সে ছেড়ে দিত না কিন্তু সে-পরীক্ষায় যেতে তার মন রাজি নয়। দুঃখ হল সুপ্রিয়ার, নিরঞ্জনকেও নিরাপদ ভাবা গেল না। কোনো পুরুষই তার মুক্তির পক্ষে নিরাপদ নয়। আর এতো সত্য কথা যে সে তার মুক্তিকেই ভালোবাসে সব চাইতে বেশি। পুরুষকে ভালোবাসার চাইতে এ ভালোবাসা ঢের বেশি নিবিড় তার মনে। যেখানে তার মুক্তি নেই সেখানেই হাঁফিয়ে ওঠে তার মন। বাড়ির কেউ কি জানবে নিরঞ্জন তাকে কতোটুকু হাঁফিয়ে তুলেছে! দাদা-বৌদি হয়ত ভাবছেন, নিরঞ্জনের সঙ্গে তার বিয়ে হওয়া উচিত। মা হয়ত ভাবছেন কুন্তলার মতো তারও একটি বর হওয়া ভালো। বিয়ে ছাড়া তার জীবনের অন্য ছক কারো মনে নেই।

কী ভীষণ একা সে! কাজই একমাত্র সঙ্গী হতে পারে তার, কোনো মানুষ নয়—কাজই মুক্তির কথা বলবে তার কানে, কোনো মানুষ সে কথা বলবে না। সুপ্রিয়া বইটা টেনে নিলে আবার।

কিন্তু পড়বারও যেন আর উপায় ছিল না তার। রাসু খবর নিয়ে এলো, একজন মেয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে চান। কে? রেবা? সুপ্রিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। নিচে নেমে রেবাকেই পেলো সে—বসবার ঘরে ম্লান মুখে বসে আছে। তাকে সঙ্গে নিয়ে উপরে নিজের ঘরে ফিরে এলো সুপ্রিয়া। তারপর বললে সে: "আমি ভেবেছিলাম চিঠিটা বুঝি পাও নি।"

"চিঠি পেয়েও দেরি হয়ে গেল আসতে। আজ টিউশনি নেই বলে আসতে পারলাম।" সঙ্কোচে উদ্বেগে ক্লান্তিতে কথাগুলোর উচ্চারণ স্পষ্ট করতে পারল না রেবা।

"একটু বোসো, আমি আসছি।" সুপ্রিয়া রেবার চা-খাবারের কথাটা জানিয়ে দিতে চলে গেল।

চেয়ারে বসে রেবা টেবিলে স্তূপ-করা বইগুলোর দিকে তাকাল একবার। বই-এর রাজ্যে ডুবে থাকেন সুপ্রিয়াদি—নিরঞ্জনদা-ও বই-এর পোকা—তাই এঁরা হয়ত ঘনিষ্ঠ: ভাবলে রেবা। এ-পাশে ও-পাশে চোখ নিয়ে মেঝেতে খুঁজে দেখল তার স্যাণ্ডেলের ধুলো-ময়লা ঘরে এসেছে কি না। বাড়িটা এমন নিঝুম কেন—কে কে আছেন, আর বাড়িতে—তা-ও ভাবলে সে। খোলা বই-এর পাতায় ঝুঁকল একটু কিন্তু দেখল, এ তার পড়ার বাইরের জিনিস। সঙ্গে-সঙ্গেই মনে হল তার, সে-ও ত সুপ্রিয়াদির জীবনের বাইরের মানুষ—কেন তিনি ডাকলেন তাকে?

ফিরে এসে সুপ্রিয়া তার বিছানায় বসে বললে: "তোমার একটা কাজের কথা বলেছিলেন নিরঞ্জনবাবু—"

"কাজ? কাজের আমার দরকার নেই সুপ্রিয়াদি। নিরঞ্জনদা

ভেবেছিলেন একা থাকতে আমার অসুবিধে হবে। একটি গেরস্ত মেয়ে আমি পেয়ে গেছি ঘরদোর আগলাবার জন্যে। সঙ্গী জুটে গেছে।" হাসতে চাইল রেবা কিন্তু তাতে তাকে আরো নিজ্জীব দেখাল।

"এ-ভাবে তুমি থাকতে চাও?" সুপ্রিয়া রেবার পাশ কাটিয়ে দেয়ালের দিকে তাকাল।

"তাছাড়া আর কী ভাবে থাকার কথা ভাবতে পারি?"

"না, আমি বলছি মাস্টারির জীবনে ভীষণ ক্লান্তি আসে—অন্তত আমার ত এসেছে।"

"যে কাজই করব তাতেই ত ক্লান্তি আসবে।"

"শুধু নিজের দরকারে যদি কাজ করতে হয় তাতে আনন্দ থাকে না।"

এই কি সুপ্রিয়াদির জরুরী কথা? রেবা যে নিজের জন্যেই কাজ করছে এখন এ-কথা বলবার জন্যেই কি তাকে ডাকা? রেবা চুপ করে রইল।

"আমি জানি নে, রেবা," সুপ্রিয়া বলে যেতে লাগল: "তুমি কোনোদিন ভেবেছ কি না তুমি কী চাও। হয়ত ভাববার অবকাশ তোমার হয় নি আগে কিন্তু এখন ভাবতে হবে। ভাবা দরকার। নিজেকে বুঝতে হবে। আমি নিজেকে বুঝতে চেষ্টা করেছি। তাই তোমাকে বলছি।"

"নিজেকে বুঝতে চাওয়ার সাহস আমার নেই, সুপ্রিয়াদি—" রেবা অন্যমনস্কের মতো অন্য দিকে চোখ নিয়ে গেল।

"কেন?"

"কী হবে বুঝতে গিয়ে? যদি বুঝি এ-জীবন আমার নয়

—কে আমাকে মনের মতো জীবন দেবে?"

"তৈরী করে নিতে হবে।" সুপ্রিয়া জোর দিয়ে বললে: "তুমি বিয়ে করতে চাও?"

"ভাবি নি।"

"আমি ভেবেছিলাম তোমার বিয়ের কথা।"

রেবা সুপ্রিয়ার মুখে তাকাল: "আপনি ভেবেছিলেন!"

"ভেবেছিলাম নিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারে কি না।"

রেবা কালো হয়ে গেল।

"আমার মনে হয়েছিল—" সুপ্রিয়া একটু উদাস শোনাল: "তোমাদের বিয়ে হলে ভালো হতো।"

"আপনি হয়ত জানেন না, আমি নিরঞ্জনদার কেনা হয়ে আছি।" রেবা তার বোঁজা গলা পরিষ্কার করে নিলে: "কতো সময়ে কতো টাকা যে নিয়েছি তার হিসেব নেই। হিসেব রেখেও লাভ ছিল না, ফিরিয়ে দেবার শক্তি কোথায়? তাঁর কাছে আমার ঋণের অন্ত নেই। তবু আমি বলব, রাস্তার ভিখিরিকে বিয়ে করতে আমি রাজি তবু নিরঞ্জনদাকে বিয়ে করতে রাজি নই।"

সুপ্রিয়া যেন খুশি হল। হাসি ফুটল ঠোঁটে। বললে: "কেন? অনুকম্পার বিয়ে বলে?"

"আপনি ভাবতে পারেন নিরঞ্জনদার অনুকম্পা আছে?" রাঙা হয়ে উঠল রেবা।

"অভিমানে তুমি নিজের উপর অবিচার করছ না ত?"

"আমি ত আমার অভিমান-ও খানিকটা!"

সুপ্রিয়া এ নিয়ে আর কথা বাড়াতে চাইল না। নিরঞ্জনের অনিচ্ছার জবাব রেবার অনিচ্ছায় পেয়ে গেছে সে। রেবাকে ভালো লাগল তার। বললে সে: "তুমি কিছু মনে করো না রেবা—আমি ভুল ভেবেছিলাম।"

মুখ নিচু করে রেবা মেঝেতে পা ঠুকতে লাগল।

তার মানে, সুপ্রিয়া ভাবল, রেবা শান্ত হতে পারছে না এবং তার কারণ নিশ্চয়ই নিরঞ্জনের এমন কোনো নিষ্ঠুরতা যার পরিচয় সুপ্রিয়া পায় নি।

চুপচাপ রইল তারা খানিকটা সময়—এ ধরনের অবস্থায় যেমনি চুপচাপ থাকতে হয় তেমনি। তারপর রেবাই কথা বললে: "নিরঞ্জনদা কোথায় গেছেন, বলতে পারেন?"

"নাঃ। ওখানে নেই উনি?"

"এখানে আসবার আগে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম—এদিকে আমার কাজের দরকার নেই এ-কথাটা জানাতে। কিন্তু তাকে দেখলাম না। একতলার ভাড়াটেরা বললে, তিনি ঘর ছেড়ে দিয়েছেন।"

"একদিন বলেছিলেন মেসে চলে যাবেন।"

"ঠিকানাটা বলেন নি?"

"জানতে চাই নি।"

রেবা হয়ত বিশ্বাস করতে পারল না সুপ্রিয়াকে তাই সামান্য একটু হেসে বললে: "আজ আমি যাই, সুপ্রিয়াদি! আপনি আর কষ্ট করে আমার কাজের খোঁজ করবেন না আর নিরঞ্জনদার সঙ্গে দেখা হলে বলবেন, তিনি-ও যেন এ-কষ্ট আর না করেন।"

উঠতে যাচ্ছিল রেবা, সুপ্রিয়া ব্যস্ত হয়ে বললে: "বোসো।

চা খেয়ে যাবে।"

"চা আমি খাই নে।"

"চা না খাও—অন্য কিছু।"

রেবাকে বসতে হল। সুপ্রিয়া শান্ত গলায় বললে: "নিরঞ্জন-বাবুর ঠিকানা পেলে তোমার কথাটা তুমিই জানিয়ে দিও, রেবা। আমার সঙ্গে হয়ত তাঁর আর দেখা হবে না।"

রেবা এক ঝলক দৃষ্টি ঢেলে দিলে সুপ্রিয়ার মুখের উপর। সুপ্রিয়া হাসছিল। চোখ নামিয়ে নিল রেবা, কোনো কথা বলতে পারল না।

চা-খাবার নিয়ে রাসু ঘরে ঢুকল।

এগারোটায় বিয়ে, মা না গেলেও পারেন। সে কি হয়, কথা দিয়েছেন, মা যাবেন। বিয়ে বাড়িতে বৌদিকেই মানায়—শাড়ি-গয়নায় ঝকঝকে যারা। তোমার মতো ছাত্রী পড়াতে চলে নি ত বৌদি—যাচ্ছে দশজন যেখানে আসবে সেখানে। দিদিভাই, মাইরি তুমিও শাড়িটা পাল্টে নাও। তাহলে তোমরাই যাও, বিয়ে-বাড়ির ফ্যাশান আমার পোষাবে না। থাক—সব তাতেই ওর জেদ যখন, থাক। মা শুধু আমার জেদই দেখছেন—জমকালো শাড়িতে বৌদিকে মানায় বলে কি আমাকে-ও মানায়? না, তুমি সন্ন্যেসিনী কি না! আঃ, ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে, আর তোমরা জটলাই করছ। আমি ত সেই কখন থেকে তৈরী—বৌদিরই যে হচ্ছে না!

সুব্রত ট্যাক্সিতে পৌঁছিয়ে দিয়ে এলো জটলাকে।

বিয়ে বাড়িতে এলো তারা। বর এসে গেছে। নিমন্ত্রিতরা

খাওয়া শেষ করছেন। ট্রাউজার-বুশশার্টে সপ্রতিভ হয়ে গেটে দাঁড়িয়েছিল কুন্তলার ছোট ভাই। সে-ই তাদের নিয়ে গেল উপরে। মা গেলেন কুন্তলার মার খোঁজে, সঙ্গে বৌদি। কুন্তলার ঘর খুঁজল সুপ্রিয়া।

একটি ছোট ঘরে মেয়েদের একটি ছোট জটলায় কুন্তলা বসে আছে। সুপ্রিয়া ঘরে ঢুকেই বললে: "বাঃ, বেশ মানিয়েছে ত তোমায়!"

"চিন্তা নেই, তোমাকেও মানাবে!"

কুন্তলার কথায় মেয়ের দল হেসে উঠল। সুপ্রিয়া জানে মেয়েরা হাসতেই এসেছে। কুন্তলার গা ঘেঁষে এসে বসল সে। বললে: "তোমাকে নিশ্চিন্ত দেখে হিংসেই হচ্ছে—আশা নেই কিছু।"

মেয়েরা চুপচাপ হয়ে গেল। কুন্তলা-ও আলাপের ভিন্ন পথ ধরলে: "খেয়েছ ত?"

"খাই নি। খাব।"

"এতো জোর দিয়ে বলছ, মনে হচ্ছে না খেয়েই পালাবে।"

সুপ্রিয়া কুন্তলাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললে: "রাগ করলেও আমি খাই, তা জানো?"

তারপর কুন্তলাকে ছেড়ে উঠে গেল সে। কুন্তলা মুখ নিচু করে ভাবলে, এ যেন তারই কুমারী জীবন তার কাছে বিদায় নিয়ে গেল।

কুন্তলার মা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বৌদিকে আর সুপ্রিয়াকে খাওয়ালেন। পরিহাস করলেন, খুব শীগগীরই যেন তিনি

সুপ্রিয়াদের বাড়ি গিয়ে এম্নি খেতে পারেন। সুপ্রিয়া বললে, যেদিন খুশি তিনি যেতে পারেন, সুপ্রিয়া নিজের হাতে তাঁকে রেঁধে খাওয়াবে। বৌদিকে অনুযোগ জানালেন কুন্তলার মা, এ কেমনতর বৌদি, ননদের জন্যে বর খুঁজে পান না। বৌদির হয়ে সুপ্রিয়াকেই বলতে হল, সেকেলে বৌদি কি না, ননদকে ভয় পান।

খাওয়ার শেষে বৌদিকে সুপ্রিয়া বললে: "আমি চলে যাচ্ছি। মাকে নিয়ে তুমি যেতে পারবে ত?"

"বিয়েটা দেখবে না তুমি? ভারি খারাপ দেখাবে!" বৌদি ধরে রাখতে চাইলেন সুপ্রিয়াকে।

"যা দেখতে খারাপ তা না দেখা খারাপ নয়।" সুপ্রিয়া যেতে যেতে বললে: "মাকে বলো, আমি চলে গেলাম।"

নিচে নেমে এলো সুপ্রিয়া। বরকে দেখে যাওয়া উচিত—ভাবলে সে। বরের ঘরেও ছোটখাট একটা ভিড়। দরজায় এসে দেখল সুপ্রিয়া। বরের সঙ্গে যে কথা বলছিল সে দরজায় তাকাচ্ছে—নিরঞ্জন। নিরঞ্জন চোখ ফিরিয়ে নিলে। হয়ত তার আগেই দরজা থেকে সুপ্রিয়া সরে এসেছিল।

বাড়ি ঢুকতে আজও আবার হাত ঘড়িতে তাকাল সুপ্রিয়া। দশটা বেজে গেছে। আজও দশটা। কিন্তু আজ কুন্তলার বিয়ে।

দাদার ঘরে আলো আছে। দাদা জেগে আছেন। ঠাকুর-চাকরও ঘুমিয়ে পড়ে নি। উপরে উঠে দাদার ঘরে আজও উঁকি দিল সুপ্রিয়া। সুব্রত রেডিও খুলে দিয়ে একটা বই পড়ছিল।

চোখ থেকে বইটা সরিয়ে বললে: "এসেছ!"

"মা আর বৌদি আসেন নি।"

সুপ্রিয়া ঘরে এলো। শাড়ি পাল্টে হাত-মুখে জল দিল। চেয়ারে চুপচাপ বসে রইল খানিকক্ষণ।

অপরিচিত একটি পুরুষের সঙ্গে আজ পরিচিত হবে কুন্তলা আর সুপ্রিয়া আজ একটি পরিচিত পুরুষের সঙ্গে অপরিচিতার অভিনয় করে এলো। পরিচয়টা-ও যেন অভিনয়ই ছিল! কোনো সত্য খুঁজে পায় না আর সে তাতে। পরিচয় ত বন্ধন। মুক্তি ছাড়া কোথায় সত্য আছে? ভালোবাসা যদি তোমাকে মুক্ত না করে তা নিয়ে তুমি কী করবে?

স্পষ্ট আলোতে বসে ভাবল সুপ্রিয়া, তারপর আলো নিভিয়ে বিছানায় যাবে বলে ফ্যান ছেড়ে দিলে।

একদিন সুপ্রিয়া নিরঞ্জনকে তার জীবনের মস্ত বড় ঘটনা ভেবেছিল! যেমনি কুন্তলা আজকের দিনকে ভাবছে। তার মেয়েলি ভাবনা সেদিন তাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল তার আকাঙ্ক্ষার পথ। সে পথে চলতে গেলে কোথায় বা পড়ে থাকবে নিরঞ্জন, কোথায় বা সেদিনের সুপ্রিয়া। তবু, তার আকাঙ্ক্ষার পথ সহজ করতে হয়ত নিরঞ্জনের দরকার ছিল। একটা অভাব-বোধের দায় থেকে তাকে বাঁচিয়েছে এই অভিজ্ঞতা। আর সে অভাব-বোধ যে সত্য অভাব-বোধ নয় তা-ও জেনেছে সে নিরঞ্জনকে জানতে পেরে। অভাব-বোধ সত্য হত যদি আজও সে নিরঞ্জনের উপর নির্ভর করতে চাইত। হয়ত নিরঞ্জনের-ও অভাব-বোধ নেই। তার মতো কাজেই হয়ত মুক্তি খুঁজবে সে-ও। যদি না খোঁজে সে দোষ কি সুপ্রিয়ার? সে দোষ

পুরুষের। কোথায় যেন পড়েছিল সে, মেয়েরা পুরুষের ভেতরে চলে যায়।

ফ্যানের একঘেয়ে শব্দের সঙ্গে নিরুত্তাপ নিঃশব্দ কথাগুলো ভাসিয়ে দিতে লাগল সুপ্রিয়া। তারপর একসময় চুপ করল তার মন। রেডিও বেজে চলেছে স্তব্ধতা ভেঙে ভেঙে। কীর্তন গাইছে যেন কে। মাথুর! সুপ্রিয়া মনে-মনে হাসল। রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ল: "হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন খানে।" নিজের সুরটাই কানে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে চাইল সে এক সময়। আর ঘুমিয়ে পড়লও।